মাসিক

সওগাত

সফর সংখ্যা, ১৪৪২

- এজরা পাউন্ডের কবিতা : ভূমিকা ও অনুবাদ
- লেখক ও তার সামাজিক দায়িত্ব
- অতীতের অন্ধ আনুগত্য
- তামাশার শহরে দুইদিন
- জুব্বুল হুজন কী?

মাসিক
সঙ্গাত
সফর ১৪৪২ | আশ্বিন ১৪২৭ | অক্টোবর ২০২০

সূচিপত্র

গদ্য

স্মৃতিবিলাস (পর্ব-২) — জিনাতুননেছা জিনাত — ০৪
শ্বাসরোধী সৌন্দর্য — তানভীর মাহমুদ — ০৭
পথশিশু — আশরাফ সাব্বির — ০৮
মহসিনের আত্মত্যাগ — জুবাইর রেজা — ১১

কবিতা

পাখিদের কূজন — সাদিয়া জান্নাত মুনমুন — ১৩
মুক্ত আলোর পাখি — যুল কারনাঈন ফাহিম — ১৪
অনন্তের আশায় — এস এম মুশফিক হাসান — ১৫
দুর্নীতি — এম এম সৌরভ — ১৫

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

কীর্তিমান শিক্ষাবিদ আবু নাসের ওয়াহেদ- মোহাম্মদ আবু সাঈদ — ১৬
এজরা পাউন্ডের কবিতা ভূমিকা ও তরজমা — জাহিদুর রহিম — ২১

ভ্রমণ

তামাশার শহরে দুইদিন (প্রথম পর্ব)- মো. রেজাউল করিম — ২৪

গল্প

ফেরা- — মোঃ তানিম-উল-ইসলাম — ৩০
মাটির ব্যাংক - — আবদুল্লাহ ইবনে আলী — ৩৩

ধর্ম

ইসলামে সাধনার স্বাদ (পর্ব-১) — ড. মাসুম চৌধুরী — ৩৫
জুব্বুল হুজন কী? – — আব্দুল কাহহার — ৩৭
রৌদ্দুরের বৃষ্টি- — হুরে জান্নাত তায়্যিইবাহ — ৩৮

গ্রন্থকথা

সূর্য-দীঘল বাড়ী — ৪২
হাঙর নদী গ্রেনেড- — সাদিয়া তাবাসসুম — ৪৪

বিজ্ঞান

মহাযজ্ঞে ধ্রুবক — জুবায়ের ইবনে কামাল — ৪৬

ক্যালিগ্রাফি ও ক্যালিগ্রাম

আয়াতুল কুরসি- — ফাতিমা তাহমিম — ৪৯
মধ্যবিত্ত- — জিহাদ বিন ফয়েজ — ৫১

কালোত্তীর্ণ

লেখক ও তার সামাজিক দায়িত্ব- অধ্যাপক ড. হাসান জামান — ৫২
অতীতের অন্ধ আনুগত্য- অধ্যাপক আবুল ফজল — ৫৪
আগে টিকে থাকা পরে সৌন্দর্য- মোতাহের হোসেন চৌধুরী — ৫৫

শ্রদ্ধা ও স্মরণ

কাজী মোতাহার হোসেনের ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী — ৫৬
কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী — ৫৮
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ৬৭তম মৃত্যুবার্ষিকী — ৬০

সম্পাদকীয়

মাসিক সওগাতের দ্বিতীয় সংখ্যায় বিশেষ কোনো চমক নেই। আমরা চমক লাগানোর চাইতে মানসম্মত কিছু লেখা পাঠকদের সমীপে হাজির করতেই বদ্ধ পরিকর। তবে মানসম্মত দুয়েকটা লেখায় চমক পাওয়া যাবে বৈ কি! তন্মধ্যে একটি, 'কীর্তিমান শিক্ষাবিদ মাওলানা আবু নাসের ওয়াহেদ' লেখাটি; কারণ এই মনীষীর ব্যাপারে একত্রে এতো তথ্যসম্বলিত লেখা দুষ্কর। 'স্মৃতিবিলাস' শিরোনামের যে অসাধারণ কোমল গদ্যটি প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তা পাঠকসমীপে বেশ প্রশংসা আদায় করে নিয়েছে; ধারাবাহিকতা রক্ষা করে গদ্যটির দ্বিতীয় পর্ব এ সংখ্যায় এসেছে। কথাসাহিত্যিক রেজাউল করিমের ভ্রমণভিত্তিক লেখাটি ধারাবাহিকভাবে তিন পর্বে প্রকাশ করা হবে- এ সংখ্যায় প্রথম পর্ব প্রকাশিত হলো। 'মিথের মাহাত্ম্য' শিরোনামের প্রবন্ধটি পাঠকদের মনে মিথ, পুরাণ সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রকাশিত প্রতিটি লেখাই 'মানসম্মত' কি-না তা বিবেচনা করবেন ঝানু পাঠককুল; বিষয়, লেখনশৈলী, বাক্যগঠন, বানান সবমিলিয়ে প্রতিটি লেখাকে 'মানসম্মত' করতে আমরা সর্বোচ্চ শ্রম দিয়েছি। তবুও, 'ভুল' বলে কিছু তো থাকেই! আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

আর হ্যাঁ, এ সংখ্যা থেকে আমরা 'স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব' নামে একটি ক্যাটাগরির বিসমিল্লা করলুম। যেখানে পত্রিকা প্রকাশিত হবার পরবর্তী মাসে জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী রয়েছে (এ দুটো দিবস গতানুগতিকভাবে স্মরণ করার উপায়) এমন 'স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব'দের স্মরণ করবো- তাঁদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞানী-গুণীদের মন্তব্য উদ্ধৃতির মাধ্যমে। অর্থাৎ, আমরা সময় হবার আগেই (Advance) আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবো- অমুকের জন্মদিন বা মৃত্যুদিন কিন্তু আসছে! সকল 'স্মরণীয়'দের যে আমরা স্মরণ করতে পারবো সে কথা কসম খেয়ে বলতে পারবো না আর সম্ভবও নয়; কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে: সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পক্ষে যথার্থ স্মরণীয়দের 'স্মরণ' করতে।

একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, প্রতিটি লেখায় প্রকাশিত মন্তব্য, অভিমত, মনোভাবের জন্য লেখক-ই দায়ী; কর্তৃপক্ষ নয়। কারণ, আমরা নিরপেক্ষ সম্পাদকীয় নীতিমালার ভিত্তিতেই সওগাত সম্পাদনা করে থাকি। আর কি? চলুন অন্দরমহলে!

সম্পাদক
আসিফ উল আলম সৈকত
মোহাম্মদ আবু সাঈদ

প্রচ্ছদ
শেখ আ.ল.ম হুমাইর কায়সান

অঙ্গসজ্জা
সাঈদ মাহমুদ সোহরাব

মূল্য:
পাঠকের তৃপ্তির উপহার
বিকাশ: 01878-431312 (**পার্সোনাল**)

স্মৃতিবিলাস (পর্ব-২)

জিনাতুননেছা জিনাত

বিদায় নিয়ে আসার সময় মা বলেছিলেন, ‘এত দেরী করে আর কখনও এসো না, কেমন?’
উত্তরে বলেছিলাম, ‘ঠিক আছে, মা।’
কিন্তু সেই কথাটা আমি রাখতে পারিনি!
বিয়ের পরে বছরে দু’বার মাকে কাছে পাবার সুযোগ হতো আমার, গ্রীষ্মের ছুটিতে আর রমজানের ঈদের পরে। সে বছর গ্রীষ্মের ছুটির ঠিক আগে নোটিশ এলো, নতুন পরীক্ষা পদ্ধতির উপর ট্রেনিং করতে হবে এবং অবশ্যই এই ছুটিতে। বদলানোর চেষ্টা করলাম অনেক কিন্তু না, সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছের কাছে পরাজিত হলাম। ভেতরে ভেতরে অস্থিরতা বেড়েই চললো। বাড়িতে ফোন করলেই মা বলতেন, ‘তোমার মুখটা মনে করতে পারছি না, অস্পষ্ট লাগে খুব! এতদিন না এলে কি হয়?’
আমার কষ্ট মাকে বুঝতে দিই না। বলি, ‘এই তো, আর মাত্র কয়েকটা দিন । ঈদের ছুটিতে কেউ আর আমাকে আটকে রাখতে পারবে না।’

এখন আমার স্কুলে চাকরির সুবাদে প্রতিদিন অনেক মায়ের সাথে দেখা হয়, যারা তাদের সন্তানের জন্য নানারকম কাজে পথেপথে ব্যয় করেন প্রায় সারাটাদিন । আমার মায়ের অবশ্য তেমন সুযোগ ছিল না, নয়টা ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি নিয়ে ভরা সংসারে সাংসারিক জটিলতায় কেটে গেছে নিত্যদিন। মায়ের অনুভূতিগুলো ছিল একেবারে অন্যরকম, আমাদের পৌঁছে দিতে বা নিয়ে আসতে স্কুলে যেতো না ঠিকই কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছি, আমাদের যে কোন পরীক্ষার জন্য মা রোজা রাখতেন! এই তো সেদিন, ২০০৯ এ, আমার এম.এড.এর মিডটার্ম পরীক্ষা ছিল, ক্লাসে গিয়ে শুনি স্যারের বিশেষ কোন সমস্যার কারণে তিনি পরীক্ষাটা সেদিন বাতিল করেছেন। অন্যান্য সহপাঠিরা খুশিতে উল্লাস করছিল, আমার ভীষণ মন খারাপ হয়েছিল সেদিন, আহ্! মায়ের রোজাটা বিফলে যাবে!

সারাবছর কতো কী যে জমিয়ে রেখে দিতেন মা আমার জন্য! সে বছরও বাড়ি গিয়ে পেলাম তালের বড়া, হাঁসের মাংস, ঝুরি পিঠা, আমের ঝুরা আচার, লেবুর আচার, তেজপাতা, বিছানা ঝাড়ু, নকশী কাঁথা...। ভীষণ সাহসী আর বিনয়ী ছিলেন মা। প্রচণ্ড মায়া ছিলো সবার জন্য। হয়তো রান্না করতে যাচ্ছেন, হাতে মাছের পাত্র। ভিখারী এসে বললো, ‘মাগো, অনেকদিন মাছ খাই না।’ অমনি রান্নার পাত্র থেকে মাছ তুলে দিয়ে দিতেন তাকে। কারো কষ্ট মায়ের সহ্য হতো না। নিখাদ ভালবাসা ছিলো সন্তানদের জন্য। কোনো একটা জিনিস তৈরী করলেই সাথে সাথে সমান ভাগ করে সবাইকে দিয়ে দিতেন, যারা দূরে থাকে, তাদের ভাগেরটা প্যাকেট করে নাম লিখে রেখে দিতেন। বাড়ির ছোট মেয়ে হবার কারণে আমার সবকিছু নিয়ে একটু বেশি চিন্তা করতেন মা। শেষের সময়টাতে মনের দিক থেকে খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। মা চলে যাবার ঠিক পঁয়তাল্লিশ দিন আগে আমার একমাত্র মামা মারা যান, তখনও আমি বাড়ি যেতে পারিনি। সে কী দুঃখ মায়ের! বড্ড অভিমান করে বলেছিলেন, ‘সবাই এসেছিল, শুধু তুমিই এলে না।’

তখন বাড়ি যেতে পারলেও মাকে একটু জড়িয়ে ধরতে পারতাম! বিধাতা এখানেও বাধ সাধলেন। রোজা শুরু হলো, ছুটির অপেক্ষায় দিন গুনছি। ঈদের কেনাকাটা চলছে। মাকে ফোন করলেই বারবার বলতেন, ‘আমার জন্য এ বছর শাড়ি কাপড় কিছু কিনবে না, যা আছে সেগুলোই পরে শেষ হবে না।’ প্রায় প্রতিদিনই মা এসব কথা বলতেন। বিশতম রোজার দিন সকালে ফোন করে বললাম, ‘এবার কিন্তু সত্যিই শাড়ি কেনা হয়নি, মা। এতবার নিষেধ করলে কি সেটা করা যায়? তবে আপনাকে কিছু না দিতে পারলে তো আমার অনেক খারাপ লাগবে। অন্য কোনকিছু দরকার হলে লিস্ট করে রাখবেন, আমি এসে কিনে দেবো।’ মায়ের সাথে এটাই আমার শেষ কথা।

সত্যি সত্যি লিস্ট করে রেখেছিলেন আমার জন্য, ‘দুধওয়ালাকে দাম হিসেবে পাঁচশ পঁচাত্তর টাকা তুমি দিয়ে দিয়ো।’

আমি জানি, পৃথিবীর সব সন্তানের কাছে তার মা-ই শ্রেষ্ঠ মা। কিন্তু আমার মায়ের মতো এতো সহজ সরল মাটির মানুষ এখনকার দিনে তেমন একটা দেখা যায় না। বাবার কাছে বা আমাদের কাছে তেমন কোন চাহিদা ছিল না কখনও। নিজের দামী জিনিসটাও খুব সহজে অন্যকে দিয়ে দিতে পারতেন। বাবার প্রতি ছিলেন প্রচণ্ড দায়িত্বশীল।

অদ্ভুতভাবে বিদায় নিয়েছেন মা, ঠিক যেন জেনেশুনে বুঝে চলে গেছেন। নিজের শাড়ি গয়না সবার জন্য ভাগ করে রেখেছেন। বাবা যখন বিশ রমজানে এতেকাফের উদ্দ্যেশে মসজিদে রওনা করলেন, তখন মা হাতটা ধরে বলেছিলেন, ‘আপনার সাথে বোধহয় আর দেখা নাও হতে পারে, আমাকে একবার তওবা পড়িয়ে দিয়ে যান।’ সেদিন শেষরাতে সেহরির পর কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন, এ অবস্থায় হঠাৎ করেই চলে গেলেন মা। পাশে বসে থাকা আট বছরের নাতিকে শুধু বলে গেছেন, ‘আমি চলে যাচ্ছি দাদু, সবাইকে গিয়ে বলো।’

নিজের জীবন থেকে সবকিছু গুছিয়ে বিদায় নিয়েছেন মা। নির্মমতা হয়েছে কেবল আমার সাথে। আমার কাছ থেকে তো বিদায় নেননি! সবাই বলে- মা কি কারও চিরকাল বেঁচে থাকে? এ কথা আমিও অনেককে বলেছি কিন্তু সে তো কেবল কথার কথা। পুরো বছরটাতে একবারও কেনো মায়ের সাথে দেখা হবার সুযোগ হলো না আমার! আজও উত্তর মেলে না কিছুতেই। সারাটা বছরে কতো কি যে যোগাড় করে রেখেছিলেন মা আমার জন্য। আমিও রেখেছিলাম অনেক কিছু। সব পড়ে আছে, এসবের ভার বহন করা যে কি কষ্টের!

শেষদিকে মা নাকি আমার লাগানো জবা গাছের পাশে বসে জোরে জোরে নাম ধরে ডাকতেন। এসব কথা কেউ আমাকে বলেনি আগে। ছোটআপু একদিন ওই অবস্থায় মা’কে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘কি হয়েছে? ওর কি কোনো সমস্যা?’ মা উত্তর দিয়েছিলেন, ‘ওর জন্য বুকের ভেতরটা ভীষণ জ্বলছে, তাই জোরে জোরে ডাকছি, যদি এতে জ্বালা কিছুটা কমে!’ মা আমাকে সারাজীবনে একটিমাত্র চিঠি লিখেছিলেন, বিশ বছর আগে। যার সম্বোধন ছিল ‘কলিজার টুকরা’... কি করে পারলো সেই টুকরাকে ছিন্ন করে চলে যেতে! বেঁচে থেকেও দীর্ঘদিন মাকে কাছে না পাওয়া, এমন শাস্তি যেন পৃথিবীর কোনো সন্তান কোনদিন না পায়।
আজও অনুভব করি, মা আমার জীবনের সব আলো নিয়ে চলে গেছে দূরে, বহুদূরে, যেখানে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করার সাধ্যি আমার নেই। তাঁর সাথে শেষ দেখা হয়েছিল, চলে যাবার ৩৫৪ দিন আগে। এত দীর্ঘ সময় আর কোনদিন মাকে ছেড়ে থাকা হয়নি। চলে যাবার পর মায়ের সাথে আমার শেষ দেখা ৩৫৪ দিন পর এক নির্মম সন্ধ্যায়। সাদা ধবধবে পোশাকে জড়িয়ে মা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যে মানুষটি বাড়িতে ঢুকলেই এক গ্লাস পানি নিয়ে এসে বলতেন, ‘পানি খেয়ে একটু জিরিয়ে নাও, মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।’ সেদিন বলেননি কিছুই, বলবেও না আর কোনদিন।

নরম শীতল মুখটা স্পর্শ করে ধীরেধীরে অনেক ডেকেছি, মনেমনে ক্ষমাও চেয়েছি বহুবার। এক আকাশ শূন্যতা একমুহূর্তে যেন গ্রাস করেছিল আমার সমস্ত অনুভূতিকে, কেন একটিবার জোর করে বললো না, একবার আমার কাছে আয়। অভিমানে বুকের ভেতরটা জ্বলে ছাই হয়ে গেছে, মা কিভাবে পারলো আমার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে চলে যেতে!

লেখক-
জিনাতুননেছা জিনাত
সিনিয়র শিক্ষক,
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

প্রকাশিত গ্রন্থ : **‘ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ : একজন জয়িতার গল্প’** (আত্মজীবনীমূলক),
এছাড়াও রয়েছে ২টি উপন্যাস, ২টি গল্পগ্রন্থ, একটি ধর্মীয়গ্রন্থ।
প্রথম কাব্যগ্রন্থ : ‘তোমার মতো কেউ ভালো নয়’।

গদ্য

শ্বাসরোধী সৌন্দর্য

তানভীর মাহমুদ

অকস্মাৎ আর অভ্যাসের মাঝে বয়ে যায় অজস্র মৎস্যময় নদী। অকস্মাতের তীরে থাকে অচেনা ও অপ্রস্তুতিতে হৃত হবার অবকাশ। অভ্যাসের কুলে থাকে লীন ও সমাহিত হয়ে না জাগবার একটি ঘূর্ণিজড়তা। অকস্মাৎ তার তাঁবু টানিয়ে বসে আছে সেই জড়তা থেকে আপনাকে ছিটকে ফেলবে বলে। ছিটকে পড়লে আহত হবেন এবং তা একটি দুর্ঘটনাও বটে। তবে সে দুর্ঘটনায় দুয়ারও খোলে। সেই দরজা দিয়ে নিজের বাইরে আপনি বেরিয়ে আসেন। যা কিছু আপনার অভ্যাসের অঙ্গ তা বস্তুত আপনারই অঙ্গ। সেই দেহ থেকে বেরিয়ে এলেই জগত নিজেকে আপনার সামনে মেলে ধরবে। জগতের নিজেকে মেলে ধরার স্বভাব রয়েছে, যা আপনার স্বভাবের কিঞ্চিত বাইরে। তবে তার সাথে একটি সম্বন্ধ গড়ে নিলে জগতও আপনাকে নিজের করে নেবে।

অকস্মাতের গভীরে সুপ্ত থাকে সুন্দর। একারণে সৌন্দর্যের মুখোমুখি হঠাৎ উপস্থিত হওয়া একটি ঝড়ো পরিস্থিতিতে ফেলে আপনাকে। তখন শ্বাস রোধ হয়ে আসতে চায়। সৌন্দর্যের সাথে বেড়ে ওঠা, জীবন যাপন করার বিষয় আছে বটে। তাতে সৌন্দর্য অভ্যাসের অঙ্গ হয়। তবে শ্বাসরুদ্ধকর এমন মিলনের সুখও তো চাই। এ হল যা আমি নই বা যা আমার নয় তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার মিলনের সামনে কম্পনের ঘটনাময়তা।

হঠাৎ করে ঘটা, আচমকা, নাটকীয়ভাবে ঘটা, এসব যে জগত থেকে আসে তার কেন্দ্রে থাকে নিজেকে অপরের মুখোমুখি করার রোমাঞ্চ। সেই রোমাঞ্চের এক প্রতিঝড়ও রয়েছে যা উড়িয়ে নেবার বদলে শীলিভূত করে দেয় আপনাকে। কেননা তা ভেতরে ঘটে। আপনার অস্তিত্বকে হরণ করে, আপনার ভেতরটাকে হয়ত হননও করে–মুহূর্তে আপনি নিজের স্বরূপ থেকে ছিটকে পড়েন, দিশেহারা হয়ে পড়েন কেননা নিজের চেনা সত্ত্বাকে খুঁজে, হাতড়ে, সাঁতরেও পান না অথবা পারেন না ধরতে। তখনই সৌন্দর্যের সাথে সংলাপ শুরু করেন–ফিরে আসার একটা পথ সেটা। বিনাশ থেক নতুন জন্ম লাভ করেন আপনি। যা আপনার নয় তা কি শত্রু? বলা কি যায়? তবে আপনি তো তাকে পাল্টা গ্রাস করতেও চাইছেন। যদিও সেই আপনাকে আগাম গ্রাস করেছে। মধুর প্রতিশোধ নেবেন নিশ্চয়ই।

সুন্দর সে যদি একটি ছবি মাত্র হয় তবে যে ধমক আপনার কোরকে লাগতে পারে তার মাঝে প্রবেশের পর তা স্তিমিত হয়ে আপনাকে হয়ত আরও বড় জলাধারে পরিণত করতে পারে, হয়ত আপনার মাঝ থেকে বৃষ্টিরও জন্ম হতে পারে। সৌন্দর্যের সাথে সহবাস, যদি একে সৌন্দর্য গমন বলি, তাতে সহজ হয়ে আসা ভাবনা ও তা থেকে জারিত নানা ফুল নিয়ে কিছু কথা হোক।

অস্তিত্ব স্তম্ভিত হয়ে যাওয়া এবং কেঁপে ওঠা সৌন্দর্য রয়েছে আপনারই ভুবনে। কিন্তু তাদের সাথে হয়ত প্রতিদিন দেখাও হয় না– হঠাৎ দেখা পাবেন তাদের।

লেখক-
তানভীর মাহমুদ
ইংরেজিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর,
এমবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অপরাধতত্ত্ব ও বিচার-এ এমএসএস

প্রকাশিত বইঃ প্রতিবিহার (কবিতা)

পথশিশু

আশরাফ সাব্বির

মুরাদপুর মোড়ে জ্যামে আটকে আছি। সিএনজির অবিরাম ঘড় ঘড় শব্দে মাথা ধরে গেছে। আমি আবার বেশি শব্দ সইতে পারি না। মিটারের দিকে তাকিয়ে দেখি ৫৬ টাকা উঠে গেছে! সেন্ট্রাল রোড থেকে এইটুকু আসতেই এত টাকা উঠলো কীভাবে? মিটারে নিশ্চয়ই ঝামেলা আছে। তাইতো ভাবি, মিটারে যেতে বললাম আর এত সহজেই কেন রাজি হয়ে গেল সিএনজিওয়ালা! ব্যাটাকে কিছু একটা বলতে নিচ্ছি এমন সময় ছোট্ট একটি ছেলে এগিয়ে আসলো গাড়ির দিকে। উদোম গা, ময়লা ছেঁড়া প্যান্টটাতে ধুলোর এমন মোটা আস্তরণ পড়েছে যে আসল রংটাই চাপা পড়ে গেছে। ছেলেটা সিএনজির গ্রিলের ফাঁক দিয়ে আংগুল ঢুকিয়ে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বললো, "স্যার কয়ডা ট্যাহা দিবেন? ভাত খামু....."

ছেলেটার কথায় অস্বাভাবিক নির্লিপ্ততা। চোখের মণিটা তার ধকধক করছে। যেন সেখানে আগুন জ্বলছে! ক্ষুধার আগুন! পকেটে হাত দিলাম। একরাশ আশা নিয়ে হাড্ডিসার ছেলেটা মলিন মুখে আমার দিকে চেয়ে আছে। মানিব্যাগটা বের করে আনবো এমন সময় ট্রাফিক-নিয়ন্ত্রক মহোদয়ের তীব্র হুইসেল। সাথে সাথে হুড়মুড়িয়ে সব গাড়ি দিল ছুট। গাড়ির সাথে সাথে ছেলেটাও দৌঁড়াচ্ছে। অনাহারে, দূর্বল শরীর নিয়ে এত জোরে তাকে দৌঁড়াতে দেখে ভারী অবাক হলাম! ছেলেটা এক হাতে এখনো গ্রিলটা আঁকড়ে ধরে আছে। যেভাবে গাছ শেকড় দিয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখে। পরক্ষণেই যান্ত্রিক গতিশক্তির কাছে হার মানে সে। ছেড়ে দেয় গ্রিলটা।

সকাল থেকে মনটা এমনিতেই খারাপ ছিল, এই ঘটনার পর আরো খারাপ হয়ে গেল। চারটে ভাতের জন্যে এই বেচারাকে না জানি কত সংগ্রাম করতে হবে! সিএনজিওয়ালার উপর ভীষণ মেজাজ খারাপ হচ্ছে। আরে ব্যাটা, সিএনজিটা একটু সাইড করলে কী এমন হতো?

-ঐ মিয়া! তখন সিএনজিটা সাইড করলে না ক্যানো? দেখলে না ছেলেটা ভিক্ষা চাইতে এলো?

-স্যার, তহন য্যামনে হুড়মুড়াইয়া গাড়িগুলান টান দিসে না! সাইড করতাম ক্যামনে আপনেই কন!

তার কথায় যুক্তি আছে। ওপেন বড় সিগনালগুলোতে গাড়ির এত লোড থাকে যে ঐসময় কোন গাড়িরই থামার কিংবা সাইড করতে পারার কথা না।

-কিন্তু তোমার মিটারে টাকা এত বেশি উঠে ক্যানো? মিটার বাড়িয়ে রেখেছো নাকি?

-জ্বে না স্যার...অহনকা মিটারের দাম বাইড়া গেছেগা অনেক! -সিএনজিওয়ালার সোজাসাপটা জবাব।

মোটেও তর্ক করতে ইচ্ছে করছে না। এরা বহুত চাপাবাজি করতে জানে। তাছাড়া চলন্ত অবস্থায় চালকের সাথে কথা বলা ঠিক না। আর এরা তো গরিব, দুটো পয়সা বেশি খাক না হয়! "জলদি চালাও" এই একটা কথা বলেই আমি চুপ হয়ে গেলাম।

এখন আছি জিইসি, লক্ষ্য নিউ মার্কেট! নিউমার্কেট যখন প্রথম এসেছিলাম তখন রিমি ছিল আমার সাথে। দিনটা ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারী, ভালবাসা দিবস! জীবনে প্রথমবারের মত প্রেমিকার হাত ধরে ভালবাসা দিবস পালন! ভেতরে ভেতরে উত্তাপটা ভালই টের পাচ্ছিলাম। দিনটা বেশ রোমাঞ্চকর ছিল আমাদের দুজনের জন্য। দিনময় রিক্সায় ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। নিউমার্কেট পৌঁছে রিমির পছন্দ মোতাবেক একটা দোকানে খেতে ঢুকলাম। বের হয়ে রিমি একটা কাণ্ড করে বসলো। আমি রিক্সা ঠিক করছিলাম।

এমন সময় কোত্থেকে একটা বাচ্চা মেয়ে দৌঁড়ে আসলো। এসেই সোজা রিমির কাছে হাত পেতে বসলো। মুখে তাচ্ছিল্যবোধক কিছু শব্দ করে মেয়েটাকে ভাগানোর চেষ্টা করলো রিমি। কিন্তু মেয়েটা নাছোড়বান্দী, যাবেই না। যেন রিমির কাছ থেকে ভিক্ষে আদায় করেই ছাড়বে। সে মুখে কিছু বলছিল না তবে তার চোখের ভাষাই তার ক্ষুধানলের কথা জানান দিচ্ছিল। রিমি সে ভাষাটা পড়তে না পারলেও আমি ঠিকই পড়তে পেরেছিলাম। মেয়েটা রিমির পিছু ছাড়ছেই না! একপর্যায়ে সে রিমির শাড়ির আঁচলের কোণা টেনে ধরে মিনতি করতে লাগলো। হঠাৎ, ঠা স স স স....! একটা শব্দ হল। ফিরে দেখে বুঝলাম রিমির প্রকান্ড এক চড় নেমে এসেছে এই কোমল পবিত্র গালে। কাঁদতে কাঁদতে দৌঁড়ে চলে গেল মেয়েটা।

-ধুরো! তুমি কি করলে এটা! ভিক্ষে দেবেনা ভাল কথা ,তাই বলে মারলে কেন?
-বেশ করেছি, আমার শাড়িটাই নোংরা করে দিলো বজ্জাত ফকিন্নীটা!
-এক কোণায় একটুখানি ধরেছে কি ধরেনি, তাতেই নোংরা হয়ে যাবে নাকি!
-তা নয় তো কি! এখন তাড়াতাড়ি রিক্সা ঠিক করো, ভাল্লাগছে না!

চোখেমুখে ভীষণ বিরক্তি। রিমির সেদিনের এই আচরণটা আমার একদমই ভালো লাগেনি। সেদিনের পর থেকেই দিনকে দিন তার বিভিন্ন আচরণ আমার বিবেকের সামনে প্রশ্নবোধক এবং বিস্ময়বোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়াতে লাগলো। তাকে বিভিন্ন বিষয়ে মানা করলে কথা শুনতে চাইতো না। রিমি প্রকাণ্ড বড়লোক ব্যবসায়ী বাবার একমাত্র মেয়ে ছিল। সব ব্যাপারেই সে ছিল মাত্রাতিরিক্ত আহ্লাদী। সে সবার সাথে খুব বেশি দাম্ভিকতা দেখাতো, কখনো কখনো এমনকি আমার সাথেও! যত সময় যাচ্ছে বুঝতে পারলাম, ধীরে ধীড়ে রিমি আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

অবশেষে এইতো ক'দিন আগে হঠাৎ ফোন করে বললো, "রিলেশনটা আমার পক্ষে আর রাখা সম্ভব না.....।" তারপর নানা অজুহাত দেখাতে শুরু করেছিল। সেগুলো অবশ্য আমাকে শুনতে হয়নি, তার আগেই আমার কাঁপা কাঁপা হাত থেকে মোবাইলটা নিচে পড়ে ভেঙে গেল....।

"এই তো স্যার, মার্কেট তো আইসা পড়লাম", ড্রাইভারের কথায় হুঁশ ফিরে আসলো। ভাবতে ভাবতে কখন যে সিএনজিটা মার্কেটের সামনে এসে থেমেছে টেরই পেলাম না। ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়লাম যান্ত্রিক খাঁচা থেকে। ক্ষুদা লেগে প্রচণ্ড। কিছু খাওয়া উচিত মনে করে অভ্যাস মোতাবেক ঢুকে পড়লাম রিমির পছন্দের দোকানটাতে। ভেতরে প্রবেশ করতেই প্রথমে চোখ পড়লো সেই কোণার টেবিলে, আমরা সবসময় যেখানটায় বসতাম।

যাক, খালিই পড়ে আছে ওটা । বেশ গমগমে একটা পরিবেশ। অধিকাংশ টেবিলই যুগলদের দখলদারী। কেউ হাতে হাত রেখে চুপচাপ বসে আছে। এমন ভান করছে যেন কেউ দেখছেইনা। কেউ বা হাসতে হাসতে একে অপরের গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। আমি ধীর পায়ে কোণার টেবিলটায় এসে বসেছি। কিছুই পাল্টায়নি। কী বা পাল্টাবে? ক'দিনে বুঝি কিছু পালটায়? মানুষ অবশ্য পাল্টায়। এখানে এতবার এসেছি যে, ওয়েটাররা আমাকে চেনে আমিও তাদের নামসহ চিনি। একটা অন্যদিনের মত যথারীতি হাসিমুখে এগিয়ে এলো মেন্যুকার্ড হাতে। আমি আনমনে বেশ কয়েকটা মেন্যু অর্ডার দিয়ে ফেললাম। মুখোমুখি রিমির চেয়ারটা ফাঁকা। সেখানে জোর করে ওর একটা কাল্পনিক মূর্তি তৈরি করার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। কল্পনাগুলোও কেমন যেন মিইয়ে যাচ্ছে দিনদিন। খাবারের সুঘ্রাণে সম্বিত ফিরে পেলাম। বেশ গরম খাবার। ধোঁয়া উঠছে। মুখে দিলেই জিভ পুড়ে যাবে। এত আইটেম দেখে আমার মনে পড়লো মানুষ তো মাত্র একজন , আমি একা, তার ওপর ওয়েটার ডবল খাবার দিয়েছে!
- সে কি! ডবল খাবার দিয়েছো কেনো?
-স্যার, আপনি তো সবসময়ই ডবল অর্ডার করতেন! রাগ যেন এসেও আসলো না। রাগ হয়েও বা কী করবো, কপালে তো লেখা নেই যে, এই ছেলের ব্রেকআপ হয়েছে। তাই বড় নিশ্বাস ফেলেই বললাম, "আচ্ছা যাও!"

অনেক সময় প্রচণ্ড ক্ষুধা পেলেও এক গ্লাস পানিতে তা উধাও হয়ে যায়। আজও ঠিক তাই হল। পানির বোতল খুলে পানি পান করতেই ক্ষুধা গায়েব। ক্ষুধাটাও রিমির মত। রিমিকে যেমন কখনো বুঝতে পারতাম না, এই ক্ষুধাকেও বুঝতে পারিনা। ২০টাকার বোতলের একটু পানি পেট ভরে গেল নাকি খাবারেও রিমির চেহারা ভেসে উঠছে বলে খেতে মন চাইছে বুঝলাম না। ধুর খাবই না শালার! এখানেও সেই সুন্দর চেহারার ডাইনির ছবি ভাসছে। বিরাট অংকের বিল মিটিয়ে চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়ি পড়লাম। হাঁটা শুরু করবো ঠিক এমন সময় মনে পড়লো টেবিল থেকে মোবাইলটাতো নিলাম না। মোবাইল নিতে টেবিলের দিকে তাকাতেই চোখে পড়লো টেবিলভর্তি খাবার। চোখটা হঠাৎ থমকে গেল। এতগুলো খাবার ফেলে যাবো? ধুর গেলাম না হয়! আমার আবার খাবার প্যাক করে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বিরক্তিকর লাগে। আচ্ছা ওরা কি করবে এই খাবার দিয়ে? আমি একটা আইটেমও স্পর্শ করিনি। আমি যাওয়ার পর এগুলো নিশ্চিত ভেতরে নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর খাবারটা প্রসেস করে অন্য কাউকে সার্ভ করা হবে। বাটপার যত্তসব। সংশয়ে পড়ে গেলাম। বুঝতে পারছি না খাবার প্যাক করে নিয়ে যাবো কিনা! হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আমার পায়ের কাছে একটা মূর্তি ভেসে উঠছে। ছোট্ট একটা ছেলে, উদোম গা ,ধূলাস্তীর্ণ প্যান্ট। আকুল চোখে চেয়ে রয়েছে টেবিলভর্তি খাবারের দিকে। চিনতে একটুও কষ্ট হয়না। আরে! এ তো সেই ছেলেটা! যে ট্রাফিক সিগনালে আমার সিএনজির পাশাপাশি ছুট দিয়েছিলো! ছেলেটার ঠিক পাশেই আরেকটা মূর্তি ভেসে উঠেছে। একটা জীর্ণশীর্ণ মেয়ে। নোংরা কাপড় পরা। মুখটা ভারী অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। যেন বহু দিনের ব্যবধানে অযত্নে রাখা দারুণ কোন তেলরঙ ঘোলাটে হয়ে গেছে। এই মূর্তিটাকে চিনতে না পারলেও আমি ধরেই নিয়েছি, এটা এক বছর আগে রিমির কাছে চড় খাওয়া সেই মেয়েটারই মূর্তি! বিমূর্ত মূর্তি দুটো আমার সামনে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে। দু'জোড়া ধকধক করে জ্বলতে থাকা চোখের মণিতে ক্ষুধার আগুন। চোখের এই প্রতীকী ভাষাটা যেন হাজার শব্দ হয়ে তাদের তীব্র নিরবতার সাফাই গাইছিল।

"ওয়েটার!", বেশ জোরে হাঁক দিলাম । আশেপাশের সবাই চমকে আমার দিকে ফিরে তাকাল। কিন্তু আমার যেন ফিরে তাকানোরও ইচ্ছে নেই। ওয়েটার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল,

-জ্বী স্যার, বলুন।
-খাবারগুলো প্যাক করে দাও।
-ওকে স্যার।
এক্সিট দিয়ে বের হওয়ামাত্রই দেখি গুটি কয়েক পথশিশু বাইরে ঘুরঘুর করছে। অদূরে রাস্তার ওপারে জটলার মত কয়েকজন বসে রয়েছে। আমাকে বেরুতে দেখেই দুটো ছেলে কাছে এগিয়ে এসেছে। ওদের চেহারায় অনেক মিল। ভাই হবে হয়ত! নাকি এটা তাদের ছন্নছাড়া জীবনের ছাঁচে গড়া অতি সাধারণ মুখচ্ছবির মিলবিন্যাস! আমার হাতে গরম খাবারের অনেকগুলো প্যাকেট, সুঘ্রাণে ম ম করছে। সোজা জটলার দিকে এগিয়ে গেলাম। যে দুটো ছেলে আমাকে দেখে এগিয়ে এসেছিল ওরা আমার পিছু নিয়েছে। জটলার প্রত্যেকটি শিশুই ভয়ানক ক্ষুধার্ত। অন্তত এই খাবারের স্বাদও যে তারা কখনো পায়নি তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি জানি ওরা এখনি হাত পাতবে আমার কাছে। ওদের সেই সুযোগটা আর দেই নি। তার আগেই প্যাকেটগুলো ওদের হাতে ধরিয়ে দিলাম। বাচ্চাগুলোর ছোট ছোট চোখগুলো বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এরা হয়তো আজ নিজেদেরকে নিজেরাই বিশ্বাস করতে পারছেনা। একজন অন্যের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। আশ্বস্ত করে প্যাকেট খুলে ধরলাম একঝাঁক পবিত্র প্রাণের সামনে। বিশাল ব্যস্ত রাজপথে ওরা রাজভোজন করছে। ওদের চোখেমুখে অদ্ভূত তৃপ্তি আর বিস্ময়। আমি জটলার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য উপভোগ করছি।

জটলার মধ্য থেকে সবচেয়ে ছোট যে ছেলেটা সে উঠে এলো আমার কাছে। বয়স ৪ এরও নিচে হবে হয়তবা। ছেলেটা দারুণ বিস্ময় নিয়ে হা করে আমার চোখাচোখি তাকিয়ে আছে। হাবভাব দেখে মনে হলো সে কিছু একটা বলতে চায়। শেষপর্যন্ত বলেই ফেললো,

-স্যার ,আপনে কানদেন ক্যান??

চোখে হাত গেলো। একি ! চোখে পানি? আমি যে কখন কাঁদতে শুরু করেছি তা নিজেও বলতে পারবো না। সাথে সাথে হেসে দিলাম। একটা মানুষ কান্নার পাশাপাশি কি করে হাসে তা হয়ত ছেলেটির জানা ছিলো না। তাই সে দ্বিগুণ বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

-না কিছু না এমনিই ,যাও ,তুমি ওদের সাথে গিয়ে খাও।

ছেলেটি আবার জটলায় ফিরে গেল। সেদিন চোখের পানি মুছতে গিয়ে বুঝলাম, পৃথিবীর সুখটা আসলে কোথায়। প্রিয়তমার সাথে হাতে হাত রেখে, পেট ভরে খেয়েও যে সুখ এত দিন আমি পাইনি, আজ সেই সুখে আমার পৃথিবী যেন টৈটুম্বুর।

সেদিন উপলব্ধি হলো যে, আমরা কারণে অকারণে প্রতিদিন কত খাবারই না অপচয় করি। আমাদের অভাব নেই, অথচ আমাদের চারপাশে তাকালেই ক্ষুধার অভাব নেই, ক্ষুধিতের অভাব নেই! কেন এই বৈষম্য? পথের ধারে ছোট্ট শিশুটি যখন খেতে না পেয়ে দিনের পর দিন ভিক্ষের জন্য হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ায়, কুকুরের মত লাথি-গুঁতো-তাড়া খায়, ক্ষুধা সইতে না পেরে ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট অর্ধনষ্ট খাবার গলাধঃকরণ করে তখন আমাদের মরচ পড়া বিবেক কি একটুও নড়েচড়ে ওঠে না? প্রতিদিন পৃথিবীর কোথাও না কোথাও ক্ষুধিতের হয়। আমরা ক্ষুধিতের নয়, ক্ষুধার মৃত্যু চাই ।

লেখক-
আশরাফ সাব্বির
শিক্ষার্থী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া

গদ্য

মহসিনের আত্মত্যাগ

জুবায়ের রেজা

সারাদেশে লকডাউন চলছে। দেশের মানুষকে ঘরের ভিতরে রাখতে মহসিনদের থাকতে হচ্ছে ঘরের বাহিরে। তবুও তাঁর আফসোস নেই, সে যেদিন পুলিশ হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছিল, সেদিন হতে একটা কথা তাঁর মাথায় ঘুরে, দেশের জন্য যদি কখনো নিজের জীবনও ত্যাগ করতে হয়, তবুও সে পিছ পা হবে না। আর মহসিন নিজেকে খুব গর্বিত মনে করবে, যদি সে দেশের জন্য শহিদ হতে পারে।

বছরখানেক আগে ফারজানা নামের এক মেয়ের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। কিছুদিন আগেই পেল খুশির সংবাদ, সে বাবা হতে চলেছে। এই সংবাদের পর তাঁদের দু'জনেরই যেন খুশির অন্ত নেই। ঈদের আগেই 'ঈদ আনন্দ' নেমে এসেছে মহসিনের পরিবারে। কিন্তু শত আনন্দেও মহসিনের মনে একটা চাপা কষ্ট বার বার জেগে উঠে। একদিকে দেশমাতৃকা প্রতি কৃত প্রতিজ্ঞা, অন্যদিকে স্ত্রীর এই অবস্থা। তাঁর স্ত্রীর এখন তাঁকেই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। কিন্তু সে অপারগ। কারণ তাঁর কাছে সবার আগে দেশমাতৃকা; তারপর অন্যসব।

করোনার কারণে কাজের চাপ বেড়েছে। কয়েকদিন ধরে ফারজানাকে ফোন করাও হয়নি। ফোন দিয়ে ক্ষমা চেয়ে ফারজানাকে বলল, "তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও। তোমার এই সময়েও আমি তোমাকে সঙ্গ দিতে পারছি না। ঠিকমত তোমার খবর নিতে পারছি না।" কথাগুলো বলতেই মহসিন খেয়াল করলো ওপাশে থেকে কীসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে। খেয়াল করতেই বুঝতে পারলো ফারজানা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। "তোমার ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। আমার দেখভালের জন্যতো কত জন আছে ঘরে। আর, তুমি তো পুরো দেশের দেখভাল করছো। এতে আমার দুঃখ কেন হবে? বরং আমিতো গর্বিত।"

অশ্রুতে সিক্ত হয়ে গেল দুজনের চোখ। ৩ দিন ধরে ১০২° জ্বর মহসিনের। সাথে শুকনো কাঁশি। ফারজানাকে সে জ্বরের কথা জানায়নি। কারণ, মেয়েটা সারাদিন অহেতুক চিন্তা করবে। আর ফারজানার এই অবস্থায় চিন্তা করা একদম ঠিক হবে না। স্বাভাবিক জ্বর ভেবে কাউকে কোন কিছু বলা ছাড়াই ডিউটি করে যাচ্ছে। ডিউটি করার সময় একদিন শরীরের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। জ্বর এত বেশি যেন ভতরে আগুন জ্বলছে। ছটফট করছে মহসিন। কিছু বলতেতো পারছেনা, শ্বাস নিতেও তার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। সবাই ধরেপরে নিয়ে গেল হাসপাতালে। পরেরদিন রিপোর্ট আসলে সবাই জানতে পারে মহসিনের করোনা রিপোর্ট 'পজেটিভ' এসেছে। মহসিন অনুরোধ করেছিল ঘরে যেন, না জানানো হয়। কিন্তু, অবস্থা বেগতিক দেখে পুলিশ কর্তৃপক্ষ মহসিনের স্ত্রীকে ফোন করে জানিয়ে দিল। ঘরের মধ্যে আতঙ্ক ছেয়ে গেল। মুহূর্তে আশপাশেও জানাজানি হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর থেকে ফোন আসতে থাকল। এ যেন 'মরার উপর খড়ার ঘা'। পরিবারের সবার চেয়ে সবচেয়ে বেশি ভয় এবং আতঙ্কে ছিল মহসিনের প্রিয়তমা। এই অবস্থায়ও সাধ্যের বাইরে ইবাদতে পড়ে আছে মেয়েটা। রোজার দিনগুলোতে নাকি দোয়া বেশি কবুল হয়। কোথাও শুনেছিল সে। আজ তারই প্রমাণ পেতে ফরিয়াদের উপর ফরিয়াদ করে চলছে সে। সময় গেলেও এই দুঃখিনীর চোখের কোণ যেন, শুকায় না।

প্রতিবছরের ন্যায় এবছরের ঈদটাও পরিবারকে ছাড়াই করতে হবে মহসিনকে। ঈদের আনন্দটা সবার ভাগ্যে থাকলেও পুলিশের ভাগ্যে থাকে না। ঈদের ছুটিতে সবাই নাড়ির টানে বাড়ি ফিরে গেলেও মহসিনদের বাড়ি ফেরা হয় না। এরমধ্যে আবার দেশে করোনার প্রকোপ।

আজ চাঁদ রাত। অন্ধকার এই রাত পেরোলেই ঈদ। সূর্যের নতুন আলোয় চারিদিক ভরে উঠবে। আনন্দ মেতে উঠবে চারিদিক। কাল আনন্দ উদযাপনের তোরজোড় প্রস্তুতি চলছে সব ঘরে। পুরো এলাকা জুড়ে আলোক সজ্জা। এত কিছুর মাঝেও আলো থেকেও অন্ধকার হয়ে আছে মহসিনের ঘরটায়। আর ঈদ মানেই তো আনন্দ। কিন্তু ফারজানার মনে আনন্দ নেই। রাতটাতে সে আলাদা কোন আনন্দের ছাপ খুঁজে পাচ্ছেনা। ম্লান হয়ে বসে আছে পালঙ্কের এক কোণে। চোখের ঘুমও উধাও। প্রাণের স্বামী আজ ক'টা দিন আইসিউতে। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে প্রতি মুহূর্তে। অথচ এমন মুহূর্তে সে তাঁর স্বামীর পাশে নেই। এর চেয়ে বড় কষ্ট আর কী হতে পারে? বিয়ের প্রথম রাতে ফারজানা মহসিনকে কথা দিয়েছিল, সুখে-দুঃখে সে তার পাশে থাকবে। কখনো ছেড়ে যাবে না। কিন্তু এই নিষ্ঠুর পৃথিবী আজ তাদের কিছুতেই কাছে যেতে দিচ্ছেনা। "করোনার ফলে পাশে যেতে দিতে পারবো না, এতে মা এবং বাচ্চা উভয়ের জন্য রিস্ক আছে" ডাক্তাররা খুব সহজে কথাগুলো বললেও ফারজানার কেমন যেন মানতে মন চায় না। ডাক্তারদের দেওয়া যুক্তিও তার কাছে মিথ্যা কথা মনে হচ্ছে। মনের অজান্তেই মুখে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "ডাক্তাররা মিথ্যা বলছে, ডাক্তাররা মিথ্যা বলছে।"

মসজিদ হতে আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে. "আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম, আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম।" সামান্য চোখ লেগে এসেছিল। আজানের ধ্বনি শুনতেই বিছানা ছেড়ে উঠে ওজু করে নিল। ফজরের নামাজ আদায় করে দু'হাত তুলে দিল মালিকের দরবারে। কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে মহসিনের হায়াত ভিক্ষা চাইতে লাগল। সেদিন আর কোন দুআ নেই। মুখে খালি একটাই কথা, "হে মালিক, তুমি আমার জীবনের বিণিময়ে হলেও মহসিনকে নতুন জীবন দান করো। হে পরওয়ারদিগার, তুমি আমার খালি হাত দু'টো কবুল করো।"

সকাল হতে হতে মহসিনের অবস্থা আরো খারাপ হতে লাগল। নিঃশ্বাস নিতে পারছে না একেবারে। মনে হচ্ছে, কেউ একজন তার হৃদয়টা ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে। চোখের সামনে ভেসে ওঠেছে, মা-বাবার পবিত্র মুখখানি। তাঁর খুব মনে পড়ছে, প্রিয়তমা ফারজানার কথা। অনাগত সন্তানের কথা! আহা! ছেলেটার মুখটা না জানি কেমন হবে। প্রিয় সন্তানের মুখ দেখা হবে না কখনো , কখনো হবে না 'বাবা' ডাকটি শোনা। চোখের কোণ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে। এই যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছেনা। কষ্টের সময় নাকি আপন কেউ থাকলে কষ্ট কিছুটা কম অনুভূত হয়। এখানে আপনতো দূরে থাক, যারা আছে তাদের চেহারাইতো দেখা যাচ্ছেনা। ডাক্তার-নার্স সবাই দৌঁড়াতে শুরু করল। মহসিনের দেহটা ওই ছোট বেডে ছটফট করতে লাগল। নিশ্বাস সে একেবারেই নিতে পারছেনা। মিনিট পাঁচেক মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে অবশেষে আত্মসমপর্ণ করলো, দেশের তরে নিজেকে উৎসর্গ করা এই সাহসী বীর। মহসিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)।
দেশমাতা তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজনকে আজ হারিয়ে ফেলল। মহসিনের বাবা-মা হারালো তাঁর একমাত্র আদরের ছেলেকে। ফারজানা হারালো তার প্রিয়তম স্বামীকে এবং অনাগত সেই শিশুটি পিতার স্নেহ-আদর, মায়া-মত, শাসন-বাসন না পেয়েই এতিম হয়ে গেল। পরিবারের সকলের অবস্থা কেমন ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর লেখে প্রকাশ করার মত এত শক্তিশালী হৃদয় এবং যথাযথ শব্দ আমার কাছে নেই। তাই, এখানেই ক্ষান্ত দিলাম।

উৎসর্গ: করোনাযুদ্ধে শাহাদাত বরণ করা 'বাংলাদেশ পুলিশ' এর সকল সদস্যদের প্রতি।

লেখক-
জুবাইর রেজা
আলিম পরিক্ষার্থী,
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া

পাখিদের কূজন

কিচিমিচি কলতানে পাখিদের রব,
সুরের নহর যেনো ভাসিয়েছে সব।
বাবুই,চড়ুই আর শ্যামাদের ঝাঁক,
দূরের নীলিমা জুড়ে বকেদের হাঁক।
মাছরাঙা পাখিগুলো ব্যস্ত যে খুব,
বারে বারে জলধারে দেয় শুধু ডুব।
হলুদিয়া পাখিরা যে ডালে বসে রোজ,
টুনটুনি গাছে গাছে বাসা করে খোঁজ।
শান্তির সরব সাথে পায়রার বাস,
জল নিয়ে খেলা করে মনোরম হাঁস।
মধুময় সুরেলাতে কোকিলের গান,
সুরেলা ঐ কণ্ঠেতে মুগ্ধ যে প্রাণ।
বাহারি রঙেতে ঘেরা টিয়েদের সাজ,
লাল আর সবুজেতে পতাকার ভাজ।
শালিক,ময়না যেনো দুটি ভাই বোন,
ময়ূর পেকম মেলে ভরে দেয় কোণ।
সন্ধ্যার নিরালাতে ডাহুকের ডাক,
নিসর্গ তিমিরেতে হুতুমের পাক।
সারাদিন কাজ শেষে নীড়ে ফিরে পাখি,
ক্লান্তির সাথেই নিদারুণ ফাঁকি।

কবি-
সাদিয়া জান্নাত মুনমুন
বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ

কবিতা

মুক্ত আলোর পাখি

উড়ে উড়ে চলে নীলাভ্রে উড়ে চলুক ঐ পানে-
বাতাসের গতি মাতোয়ারা করে ধেয়ে আসে এই বানে!
উড়ে দিগন্তে, মরু-সীমান্তে দেখা যায় ঐ সাকি,
সোনার খাঁচায় বন্দি মানেনা মুক্ত আলোর পাখি।

উড়ে বিহনে, নব-জাগরণে উড়ে চলে দূর পায়,
বাতাসের আগে ছুটে চলে, তাঁর খোঁজ পাওয়া বড় দায়।
শ্বেত পাখা তাঁর অবিরত কল, শোনা যায় তাঁর ধ্বনি;
আকাশের বুকে ঘন হয়ে ওঠে তাঁর চক্ষুমণি!

গাছে গাছে কত মেলা বসে দেখো উড়ে আসে কত পাখি,
শ্বেত পাখনায় ভর করে আসে মুক্ত আলোর পাখি!
ডালে ডালে তাঁর রাজকীয় বেশ, রাজকীয় তাঁর শ্রুতি;
আঁধারের কোলে আলো ফুটিয়ে মেলে ধরে তাঁর খুঁটি!

আকাশে-বাতাসে, মরুতে- সীমাতে থেমে নেই তাঁর চলা,
সত্য প্রকাশে সদা তৎপর বাঁধাহীন তাঁর ঝলা।
ভয় নেই তাঁর পাখনা হারানোর কঠিন মুসিবতে,
দিলজুড়ে তাঁর শক্ত তাকৎ ভিন্নতা নেই মতে!

ধূলোর ধরায় লয়ে যাবেনা তাঁর অসীম সঠিক চাঁদর,
হৃদয়ে তাঁর অবিনাশী তেজ জ্বলে দাও দাহন!
কুঞ্জবনের প্রেমের জলসা ফূর্তিতে সবে ডাকি;
আসছে ফিরে ঐ সে দেখো মুক্ত আলোর পাখি

কবি-
যুল কারনাঈন ফাহিম
শিক্ষার্থী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া

দুর্নীতি

এমন দেশের মানুষ আমি
এমন জাতির লোক,
লেখা পড়া খেলার মাঝে
দুর্নীতি আর পোক।

স্বপ্ন ছিল গড়বো জীবন
এই দেশেরই জন্য,
সকল আশা ভেস্তে গেলো
দুর্নীতি আজ পণ্য।

স্বপ্ন নিয়ে ছুটে ছিলাম
ঊর্ধ্ব আকাশ পানে,
গড়বো জীবন ফুলে ফলে
আনন্দ আর গানে।

কবি-
এস এম সৌরভ
বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ

অনন্তের আশায়

শরতের কৃষ্ণচূড়া রক্তিম লালে রিক্ত,
গোলাপের সৌরভ ব্যাপিত
পাখির কলতানে ধরা শোভিত;
তবুও কোন এক প্রান্তে
নীরবে অপলক চাহনিতে
অনন্তের দিকে চেয়ে চাঁদনীর আলোয় সিক্ত।

ঝরে পড়েছে ফুল
জীবনটাও মাকাল ফলের ন্যায়
ঘুনে ধরেছে ফ্রেমে বাঁধা ছবিটি;
জীবন হতাশ করেছে
ভেঙে দিয়েছে স্বপ্ন
তবুও আশা করে অনন্ত ছুঁতে ছেলেটি।

তোমাদের শহরের আলো ছুঁইনি
এই প্রান্তরের কোন দ্বারে,
তবুও এই প্রান্তরের আলো
ছুটছে সেই শহরের বাঁকে।

আশায় বাঁচে স্বপ্ন
আশায় নৈরাশ্য
আশার বুকে দানা বেঁধে
আশায় করেছে পণ্য।

কবি-
এস এম মুশফিক হাসান
এইচএসসি পরীক্ষার্থী,
সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ

কীর্তিমান শিক্ষাবিদ মাওলানা আবু নাসের ওয়াহেদ

মোহাম্মদ আবু সাঈদ

আঠারো-উনিশ শতকে আধুনিক শিক্ষার প্রতি বাঙালি মুসলমানের বৈরীভাব, অনাগ্রহতা এবং ক্ষেত্রবিশেষ বিদ্বেষ একটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব— এ ভয়ানক সমস্যা থেকে বাঙালি মুসলমানকে বের করে আনতে ইংরেজরা একেবারেই চেষ্টা করেনি, এ কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। ইংরেজদের অল্পবিস্তর চেষ্টার সর্বোৎকৃষ্ট সাক্ষ্য হিসেবে হাজির হয় মাদ্রাসা শিক্ষার নতুন পদ্ধতি 'নিউ স্কিম'। এই নিউ স্কিম মাদ্রাসার প্রাণপুরুষ বলা হয় শামছুল ওলামা মাওলানা আবু নাসের ওয়াহেদকে। এই কীর্তিমান শিক্ষাবিদকে নিয়েই আজকের আলোচনা।

১৯১২ সালের ৪ এপ্রিল ভারত সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব মঞ্জুর করে এবং তাতে আলাদা 'ইসলামিয়াত বিভাগ' চালু করা যায় কিনা তজ্জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। সে কমিটির ক্রমানুসারে পঞ্চম ব্যক্তিটি মাওলানা আবু নাসের ওয়াহেদ। তাঁর একক প্রচেষ্টাতেই ১৯১৩ সালে স্যার রবার্ট নাথানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে মাদ্রাসার নতুন শিক্ষাপদ্ধতির প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবে ছিল:

জুনিয়র ক্লাসসমূহের জন্য: উর্দু, বাংলা, অংক, ভূগোল, ইতিহাস, ইংরেজি, আরবী, সাহিত্য, ড্রইং, হস্তশিল্প ও ড্রিল ইত্যাদি।
সিনিয়র ক্লাসসমূহের জন্য: আরবী সাহিত্য, ইংরেজি ও অংকের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ।

মাদ্রাসার এই নতুন শিক্ষাপদ্ধতি (নিউ স্কিম) সরকার মঞ্জুর করে, ১৯১৪ সালের ৩ জুলাই। ১৯১৫ সালের পহেলা এপ্রিল এই নিউ স্কিম মাদ্রাসা প্রবর্তন হয়। সরকার কর্তৃক ঘোষণাপত্রে বলা হয়: "এই নতুন সংস্কার অনুযায়ী যেসব মাদ্রাসা পুরনো রীতির পাঠ্য ও শিক্ষা পদ্ধতি চালু রাখিবে সেসব প্রতিষ্ঠানকে সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চিত করার জন্য চেষ্টা করা হইবে। যেসব মাদ্রাসা এই নূতন স্কীম যথারীতি তাড়াতাড়ি কার্যকরী করার জন্য আগাইয়া আসিবে সরকারী সাহায্যের ব্যাপারে ঐ মাদ্রাসাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। এই সব মাদ্রাসায় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যোগ্য শিক্ষক মণ্ডলীরও বন্দোবস্ত থাকিতে হইবে।"

আধুনিক এবং ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে এই নিউ স্কিম পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে বাঙালি মুসলমান আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। "বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি (১৮৮৫-১৯২১)" বিষয়ে পিএইচডি-সম্পন্ন গবেষক ডক্টর আব্দুল্লাহ আল-মাসুম তাঁর এম.ফিল. থিসিসে লিখেছেন: "সরকার সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মীয় শিক্ষা চালু না করলেও মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনীকিকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা আমরা দেখতে পাই ১৯১৪ সালে 'নিউস্কিম মাদ্রাসা কোর্স' প্রবর্তনের মাধ্যমে। এ কোর্সে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে অতি অল্প সময়ে এ শিক্ষা পদ্ধতি মুসলিম সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করে।" (বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি : মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, বাংলা একাডেমী, ২০০৭, ২১৫ পৃষ্ঠা)

মাদ্রাসা শিক্ষায় নিউ স্কিম পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে মাওলানা আবু নাসের ওয়াহেদ বাঙালি মুসলমানের খুব বড়ো উপকার করেছিলেন— তাঁর প্রস্তাবিত ও প্রবর্তিত এ শিক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যমেই আধুনিক শিক্ষার প্রতি বাঙালি মুসলমানের অনাগ্রহী ও বিদ্বেষী ভাব আস্তে আস্তে কমতে শুরু করে। খ্যাতিমান সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দীন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: "১৯২৩ সালের কথা। অবস্থাপন্ন কৃষকেরা তখন লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন কিছু কিছু উপলব্ধি করাও শুরু করেছেন। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় লোকের সমস্যার সমাধান নিউ স্কিম মাদ্রাসা। এ ধরনের বিদ্যালয় কৃষকসমাজকে বেশি করে আকৃষ্ট করছিল। আজ যখন সেদিনের কথা ভাবি, তখন মনে হয়, আবু নাসির ওয়াহিদ আই. ই. এস. নিউ স্কিম মাদ্রাসা সিস্টেম প্রবর্তন করে তৎকালীন মুসলিম সমাজের যথেষ্ট উপকার করেছিলেন। দুনিয়া আখেরাতের সমন্বয় সাধনের ফলে মুসলিম সমাজের দৃষ্টি আধুনিক শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হয়।

শামসুল ওলামা মওলানা আবু নাসির ওয়াহিদ আই. ই. এস. প্রবর্তিত নিউ স্কিম মাদ্রাসা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। নিউ স্কিম মাদ্রাসায় ছেলেদের মধ্যে অনেকে পরবর্তী জীবনে পাণ্ডিত্য খ্যাতি দুই-ই অর্জন করেছিলেন। পরলোকগত ডক্টর আবু মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, অধ্যাপক আবুল ফজল, অধ্যাপক ডক্টর আবদুল হাই প্রমুখ ছিলেন নিউ স্কিম হাই মাদ্রাসা পাস।"
(আত্মস্মৃতি অখণ্ড সংস্করণ : আবু জাফর শামসুদ্দীন, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫, ৫৪ ও ৬৯ পৃষ্ঠা)

মাওলানা আবু নাসের ওয়াহেদ প্রবর্তিত নিউ স্কিম মাদ্রাসা চালুর পেছনে একটা গুপ্ত কিন্তু বিরাট উদ্দেশ্য ছিল। নিউ স্কিম মঞ্জুরীর পর তৎকালীন ভারতীয় বৃটিশ সরকার যে বিবৃতি দেন তন্মধ্যে উল্লেখ ছিল: "একদিক হইতে একথা বলা যাইতে পারে যে, এই স্কীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছাত্র তৈরির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে।"

বিশিষ্ট গবেষক ডক্টর ওয়াকিল আহমদ বলেন: "তিনি তদানীন্তন ছোটলাট স্যার ব্লুমফিল্ড ফুলারের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং 'রিফর্মড মাদ্রাসা স্কীম'র প্রস্তাব দেন। তাঁর এই নতুন চিন্তাধারা কার্যে রূপান্তরিত করার জন্য নবাব সলিমুল্লাহ, নওয়াব আলী চৌধুরী ও সৈয়দ শামসুল হোদা তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।... গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা যুগের চাহিদা মিটাতে পারছে না, সেযুগের দু'একজন প্রগতিশীল চিন্তানায়কের মত তিনিও তা উপলব্ধি করেন এবং এর সংস্কারের জন্য আন্দোলন করেন। তিনি বহু শ্রম স্বীকার করে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে তারপর এই নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করতে সক্ষম হন। এটাই তাঁর জীবনের জ্ঞান-সাধনা ও তাঁর চিন্তাকর্মের প্রধান কীর্তি।"
(উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা : ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমী নিউ দিল্লী, ১৯৮৩, ১২৯-৩০ পৃষ্ঠা)

জাতীয় অধ্যাপক জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক স্যারও এ সম্পর্কে বলেছেন: "তখন মুসলিম প্রধানদের মধ্যে কিছু লোক বললেন: মুসলিমস উইল নট এ্যাক্সেপ্ট ইংলিশ এডুকেশন আনলেস এ টিঞ্জ অব রিলিজিয়াস ইনস্ট্রাকশন ওয়াজ দেয়ার। এজন্য এ্যারাবিক, পারসিয়ান শুড বি গিভেন এ মোর ইমপোরট্যান্ট প্লেস। এই ধারণা নিয়েই নিউ স্কিম দাঁড় করানো হয়েছিল: নাইদার মাদ্রাসা, নর—ইংলিশ হাই স্কুল। মুসলিম নেতাদের ইচ্ছা ছিল : এই নিউ স্কিম-এর কোপিং স্টোন হবে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ-এর ফ্যাকাল্টি। এখানে ইয়ং মেন উইল হ্যাভ বিন ট্রেইন্ড ইন এ্যারাবিক, পারসিয়ান, উর্দু, উইথ সাম রিলিজিয়াস ভিউ। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ইসলামিক স্টাডিজ-এ জয়েন করে উইল এ্যক্ট এজ লিডারস অব দি মুসলিমস। আবু নাসের ওয়াহেদ সাহেব তখন মাদ্রাসার (ঢাকা মাদ্রাসার) প্রিন্সিপাল। হি ওয়াজ দি প্রপোনেন্ট অব দিস আইডিয়া। অন্যান্য মুসলমান যারা ফেল্ট লাইক দ্যাট, অন্তত এরকম কোন আইডিয়া তাদের পক্ষ থেকে পাওয়া যায় না। আবু নাসের ওয়াহেদের নোট আছে: দ্যাট দিস ওয়াজ দি অরিজিনাল আইডিয়া বিহাইন্ড ঢাকা ইউনিভার্সিটি : এ্যাট লিস্ট ওয়ান অব দি আইডিয়াস। দেয়ারফোর ইসলামিক স্টাডিজ শুড বি সেন্টার পিস। বাই ইট ওয়াজ এ্যলাওড টু ডাই। আবু নাসের ওয়াহেদের পরে আর কেউ এটা নিয়ে খুব লড়াই করে নি।" (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক-এর আলাপচারিতা : সরদার ফজলুল করিম, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৪, ৩৭ পৃষ্ঠা)

এখানে রাজ্জাক স্যারের বয়ানে আবু নাসের ওয়াহেদের মূল অবদান স্পষ্টরূপে চিহ্নিত হয়। সেজন্যই আমরা দেখি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কমিটিতে মুসলিম শিক্ষাবিদ হিসেবে আবু নাসির ওয়াহিদের গুরুত্ববহ অন্তর্ভুক্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আর্থিক তহবিল গঠন করেন এবং বিশেষত মুশুরীখোলার তৎকালীন পীর সাহেব শাহ আহসান উল্লাহর কাছ থেকে তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করে দেন। কমিটির সদস্য হিসেবে তহবিল গঠন করার জন্য ন্যূনতম আদেশ না থাকা সত্ত্বেও ব্যাক্তিগত উদ্যোগ থেকে সে-সময়ে তহবিল গঠন করার মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলিম সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর দৃঢ়-আকাঙ্ক্ষা প্রতিভাত হয়।

মাওলানা আবু নাসের ওয়াহেদ ১৮৭২ সালে সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। সিলেট সরকারী হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং মুবাবিচাঁদ কলেজ থেকে ১৮৯২ সালে বিএ পাশ করেন। ১৮৯৭ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আরবিতে অনার্সসহ এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন— তাঁর পূর্বে কোনো বাঙালি মুসলমান আরবিতে অনার্স করেননি, তিনিই প্রথম। কর্মজীবন শুরু হয় ১৯০১ সালে: প্রথমে সিলেটের সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা এবং পরবর্তীতে গৌহাটি কটন কলেজের আরবি ও ফার্সি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯০৫ সালে ঢাকা মাদ্রাসার (বর্তমানে কবি নজরুল কলেজ) সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে তিনি সরকারিভাবে নিয়োজিত হন— ১৯২৭ সালে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল তবিয়তে ছিলেন; মাঝখানে ১৯১৯ সালে উক্ত মাদ্রাসা নিউ স্কিম সিস্টেমের ভিত্তিতে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে রূপান্তরিত হলে তিনি সুপারিনটেনডেন্ট থেকে অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। ১৯০৯ সালে ভারতীয় ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে 'শামসুল উলামা' উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। ১৯১৪-১৫ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে তিনি 'আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ' বিভাগের পরিকল্পনা তৈরি করেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের জন্য তাঁর অবদান এবং ঢাবির প্রতি মুসলমান ছাত্রদের আকৃষ্ট করার জন্য তাঁর উদ্ভাবিত নিউ স্কিমের প্রয়োগ ঐতিহাসিকভাবে ফলপ্রসূ। সেই মোতাবেক, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর 'আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ' বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান অর্থাৎ অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন— এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে জড়িত থাকা শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে তিনি অন্যতম। সে-সময়ে ঢাবির একাডেমিক ও একজিকিউটিভ কাউন্সিলেরও সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি।

পাণ্ডিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত অবদানের জন্য তিনি ১৯২১ সালে ভারত সরকার কর্তৃক আই.ই.এস (ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস) ক্যাডারভুক্ত হন। তিনি কত সাল পর্যন্ত ঢাবির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ১৯৩৪ সালে তিনি হজ পালন করেন, সেই সফরে মিশর আল-আযহারেও গিয়েছিলেন। চল্লিশের দশকে তিনি জড়িয়ে পড়েন রাজনীতিতে— ঠিক কোন্ দলের সাথে জড়িত ছিলেন তা উদ্ধার করা দুষ্কর হলেও এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তিনি ১৯৩৭-৩৮ সালে আসামের প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন ৯ মাস এবং আসামের বিধান সভারও সদস্য ছিলেন। দেওয়ান নূরুল আনোয়ার বলেন: "তিনি প্যান ইসলামি চিন্তাধারা দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছিলেন।"—এই প্রভাবেই সম্ভবত তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।

তিনি কেবল মাদ্রাসা শিক্ষার নিউ স্কিম, ঢাবির ইসলামিক স্টাডিজেরই প্রাণপুরুষ ছিলেন না, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসাকে ১৯৩৫ সালে কামিল হাদিসে মঞ্জুরীদানের পেছনেও তাঁর একক প্রচেষ্টা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। বলা যায়, একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা দূরীকরণের জন্যই তিনি সাধনা করে গিয়েছেন আমরণ।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সূফিধারার একনিষ্ঠ অনুসারী। তাঁর বাবা কাজী জাবিদ আলী মওলানা কারামত আলী জৈনপুরীর খলিফা ছিলেন। তিনি ছিলেন ঢাকার শাহ সাহেব লেনস্থ মশুরিখোলা দরবারের পীর সাহেব শাহ আহসান উল্লাহ রহ.-এর মুরীদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি স্ব-পীর সাহেবের কাছ থেকে তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। পীরের প্রতি তাঁর আনুগত্য এবং অন্তরঙ্গতার নিদর্শন হিসেবে দেখা যায়, ইন্তেকালের পর তাঁকে সিলেটের নিজগ্রামে কবরস্থ না করে শাহ সাহেব বাড়ি তথা পীর সাহেবের পারিবারিক কবরস্থানে কবরস্থ করা হয়। এ থেকে তাঁর সূফিমানস অনুমান করা কঠিন নয়। তিনি ইন্তেকাল করেন ১৯৫৩ সালের ৩১ মে, যখন তাঁর বয়স ৮১।

প্রত্যক্ষদর্শী আবু যোহা নূর আহমদের বর্ণনায়: "লম্বা চাপ দাড়িতে মুখমণ্ডিত, স্বাস্থ্য সুন্দর, সাদা পায়জামা ও সাদা কোর্তা গায়ে, মাথায় জরিদার টুপি পরিহিত শামসুল উলামা ঢাকার সদরঘাটে প্রায়ই বৈকালিক ভ্রমণ করিতেন। ভ্রমণের পর নবাববাড়ীর মসজিদে গিয়া মাগরিবের নামাজ আদায় করিতেন। ইহার পর নবাববাড়ীর বন্ধুবান্ধবদের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া রাত্রে বাসায় ফিরিতেন।" (জালালাবাদের কথা : দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, ৩৩৭ পৃষ্ঠা)

তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে:
বাকারাতুল আদব, মিরকাতুল আদব, সালসিল কিরয়াত, নুখাবুল উলুম, মাদারিজুল কিরয়াত।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে প্রসিদ্ধগণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আব্দুল জব্বার খান, প্রাক্তন মন্ত্রী আজীজউদ্দীন আহমদ, ডক্টর সিরাজুল হক, মাওলানা ফজলুল করিম এবং আবু জাফর শামসুদ্দীন প্রমুখ।

তাঁর অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগণ: নওয়াব সলিমুল্লাহ, নওয়াব সৈয়দ শামসুল হুদা, নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, একেএম ফজলুল হক প্রমুখ।

মাদ্রাসা শিক্ষায় নিউ স্কিম প্রবর্তনের মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা-সংকট দূরীকরণ এবং ঢাবির প্রতি বাঙালি মুসলমানের আকৃষ্টতা সৃজনে আবু নাসের ওয়াহেদের অবদান একক এবং চিরস্মরণীয়। একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে আমরণ যে মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি নিরলস গতিতে কাজ করে গিয়েছেন তা বর্তমান সময়ের শিক্ষাবিদদেরকেও অনুপ্রেরণা যোগাবে, সন্দেহ নেই। বাঙলার শিক্ষাক্ষেত্রে একজন কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁকে স্মরণ করা উচিত।

তথ্যসূত্র:
১. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস : আবদুস সাত্তার, মোস্তফা হারুন অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪
২. জালালাবাদের কথা : দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭
৩. উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা : ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমী নিউ দিল্লী, ১৯৮৩, ১২৯-৩০ পৃষ্ঠা
৪. বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি : মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, বাংলা একাডেমী, ২০০৭
৫. আত্মস্মৃতি অখণ্ড সংস্করণ : আবু জাফর শামসুদ্দীন, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫
৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক-এর আলাপচারিতা : সরদার ফজলুল করিম, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৪
৭. বাংলাপিডিয়া, গুগল

লেখক-
মোহাম্মদ আবু সাঈদ
তথ্য সংগ্রহ করে লিখুন

প্রকাশিত বইঃ বাংলা কাব্যে নবী বন্দনা

এজরা পাউন্ডের কবিতা

ভূমিকা ও তরজমা : জাহিদুর রহিম

এজরা পাউন্ড কবি, সমালোচক, সম্পাদক, অনুবাদক হিসেবে বিশ শতকের বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। ইংরেজি সাহিত্যে আধুনিক কবিতার সূচনা যে কয়জন কবির হাতে তাদের মধ্যে এজরা পাউন্ড অন্যতম। 'চিত্রকল্পবাদ' বা 'Imagism'-ধারণার প্রবক্তা হিশেবে সুপরিচিত এজরা পাউন্ড ছিলেন সে সময়কার অনেক কবি লেখকদেরই গুরুস্থানীয়।

ইংরেজ বংশোদ্ভূত আমেরিকান এই কবি, জন্মেছেন ১৮৮৫ সালের ৩০ অক্টোবর। শৈশব থেকেই কবিতার প্রতি তার আগ্রহ। আমৃত্যু কবিতার প্রতি তার আকর্ষণ রয়ে গেছে।

তাঁর সময়ে ইংরাজি ও আমেরিকান সাহিত্যের আধুনিকতা, সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অ-পশ্চিমী এবং প্রাচীন সংস্কৃতির নানাদিককে কবিতায় নিয়ে আসা এবং প্রথা-জাড্যকে নির্মমভাবে অস্বীকার করার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন তিনিই। কবিতার পাশাপাশি তিনি লিখেছেন সমালোচনা ও কবিতা বিষয়ক গদ্যও। করেছেন বিস্তর অনুবাদও। প্রাচীন চৈনিক কবিতাকে তিনি পশ্চিমা সাহিত্যজগতের সামনে নতুনভাবে তুলে ধরেন। একজন সমালোচক ও সম্পাদক হিসেবে পাউন্ড এমন অনেককে আবিষ্কার করেছেন, সাহস যুগিয়েছেন, যাদের অনেককেই বিশ্বসাহিত্যের একেকজন দিকপাল হিসেবে আজ আমরা জানি। এদের মাঝে জেমস জয়েস, টি.এস.এলিয়ট, রবার্ট ফ্রস্ট ও আর্নেস্ট হেমিংওয়ে উল্লেখযোগ্য। একজন প্রাবন্ধিক হিসেবে আমরা তাঁর কাছ থেকে কবিতার আঙ্গিক, শৈলী ও বিষয় নিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান মন্তব্য পেয়েছি। পাউন্ডের সাহিত্যকর্মের কথা বলতে গেলে আলাদাভাবে কোনও কবিতাগ্রন্থের কথা উল্লেখ করা মুশকিল, বরং তাঁর সমগ্র কাব্যকীর্তিকেই অখণ্ড এক অভিযান হিশেবে বিবেচনা করা যায়। এমনকি তাঁর অনুবাদ কবিতাগুলিকেও মৌলিক সাহিত্যের মর্যাদা দিতে কারও কুণ্ঠাবোধ হবার কথা নয়। গদ্যগ্রন্থ ABC of reading কবি ও কবিতাপ্রেমী পাঠকদের জন্যে অবশ্যপাঠ্য একটা বই।

পাউন্ড ছিলেন নিরীক্ষাধর্মী কবি, সাহিত্যজীবনের পুরো সময়টাই কবিতার বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। তাঁর ছোট ছোট কবিতাগুলো থেকে মাস্টারপিস বলে খ্যাত 'ক্যান্টোস' পর্যন্ত তাঁর নিরীক্ষা কখনও থেমে থাকেনি এবং এক্ষেত্রে তার সাফল্য ও সার্থকতা বিশ্ববিদিত। আর এর ফলস্বরূপ তার প্রতিটি কাব্যগ্রন্থই আমাদের নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করায়। পাউন্ডের কবিতা পরবর্তী অনেক কবিকেই প্রভাবিত করেছে। এ প্রসঙ্গে টি এস এলিয়টের মন্তব্য— "পাউন্ডের কবিতা কেবল যেমন ভাবা হয়— তার চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণই নয়, বরং তা ধারাবাহিক উন্নতিরও চিহ্ন রেখেছে।"

জীবনের বেশিরভাগ সময়ই তিনি ভ্রমণ করেছেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন এবং ফ্যাসিবাদের সমর্থক হয়ে উঠেন। ফ্যাসিবাদের সমর্থন ও ফ্যাসিবাদী প্রচারণার জন্যে ১৯৪৫ সালে ইতালিতে তিনি আমেরিকান সৈন্যদের হাতে বন্দি হন। সামরিক কারাগারে বন্দি অবস্থায় মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় ওয়াশিংটনের সেন্ট এলিজাবেথ মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে, সেখানে তার প্রায় বার বছর কেটে যায়। বিভিন্ন কবি-লেখকদের প্রতিবাদের মুখে আমেরিকান সরকার তাকে গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। জীবনের শেষ বছরগুলো তিনি ইতালিতেই কাটিয়ে দেন। ১৯৭২ সালের পহেলা নভেম্বর পাউন্ড মৃত্যুবরণ করেন।

অনুবাদ প্রসঙ্গে পাউন্ড বলেছিলেন: "No translation has to reproduce all aspects of the original. It can choose to concentrate on only some aspects. It can leave part of the original out. It may even add to it or rearrange it in order to accomplish the translator's purpose."

অনুবাদ করার সময়ে আমি ওনার এই কথাগুলো মাথায় রেখেছি, জানি না আমার অনুবাদে এর কতটা প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছি। তবে আশা করি ওনার একটা আদেশ আমি যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছি, আর তা হল: "translations should be new poems..." আদৌ পেরেছি কিনা তা বিচার করবেন আপনারা।

ক. মেট্রো ষ্টেশন

ভিড়ের মাঝে ভেসে ওঠা মুখ,
যেন ঘন ভেজা ডালে মেলানো পাপড়ি।

খ. এবং এই দিনগুলো যথেষ্ট নয়

এবং এই দিনগুলো যথেষ্ট নয়,
এবং এই রাতগুলো যথেষ্ট নয়,
এবং ঘাস না নড়িয়ে ছুটে চলে ইঁদুরের মতো
পিছলে চলে জীবন।

গ. অভিবাদন

এই যে শোন,
আত্মতুষ্ট আর অসুখী প্রজন্ম,
আমি দেখেছি জেলেদের সূর্যালোকের চড়ুইভাতি,
দেখেছি তাদের দলানো সংসার
আর উচ্ছ্বাসে দাঁত বের করা মুখ,
শুনেছি তাদের অভব্য হাসি;
আমি তোমাদের চেয়ে সুখি
এবং তারা আমার চেয়েও,
এবং আরও সুখি
হ্রদে সাঁতার কাটা মাছেরা
যাদের নিজস্ব কোনো বস্ত্র নেই।

ঘ. বালিকা

গাছ ঢুকে গেলো হাতে,
কাধে সপসপে ভেষজ রস,
স্তনের নিচে বেড়ে উঠছে বৃক্ষ,
বাহুর মতো ফুঁড়ে বেরুচ্ছে শাখা।
তুমি এক বৃক্ষ,
তুমি এক শ্যাওলা ঢাকা উদ্ভিত,
ঝড়ের ঝাপটা খাওয়া তুমি এক ভায়োলেট গাছ,
তুমি যেন একটি শিশু – এত উঁচু;
বাকি সবকিছু পৃথিবীর মূর্খতা।

ঙ. নর্তকী

কৃষ্ণচক্ষু রমণী,
ওগো – মোর স্বপ্নচারিণী,
হস্তিদন্তশোভাময় চর্চিত চন্দন,
অদ্বিতীয়া তুমি, তোমার মতো নেই কেউ,
নেই কেউ এত দ্রুতপদ।
তোমাকে পাইনি খুঁজে তাঁবুতে,
ছেঁড়া আধারের মাঝে,
তোমাকে পাইনি খুঁজে কুয়োতলায়
কলসি কাঁখে ঝুঁকে থাকা রমণীদের ভিড়ে।
পা , বাকলের নিচেকার ছোট চারাগাছ,
মুখ, এক আলোকিত নদী,
কাঁধ অপরূপ সফেদ কাজুবাদাম,
যেন নতুন খোসা ছাড়ানো বাদামের শাঁস।
তোমার প্রহরায় তামার ভোজালি হাতে খোঁজা নেই,
তোমার বিশ্রামাসনে সোনা মোড়ানো নীলকান্তমণি
আর রূপোর মোড়ক,

স্বর্ণতন্তুর নকশি-তোলা একটি বাদামি আভরণ
ছলকিয়ে তোলে তোমার শোভা;
হে নাতহাত ইকানাই, তুমি যেন নদী-তীরের মাছ।
তৃণ ভুমে বয়ে যাওয়া শাখা নদীর মতো
আমার শরীরে তোমার হাত,
প্রতিটি আঙ্গুল যেন হিমেল জমাট স্রোত!
আর যারা নিবেদন করে গান,
সেই কুমারী সখিগণ যেন ধবল পাথর;
অদ্বিতীয়া তুমি, তোমার মতো নেই কেউ,
নয় কেউ এত দ্রুতপদ।

চ. অমরত্ব

যদিও গেয়েছি গান আলস্য ও প্রেমে,
রিক্ততা ছিল সবচেয়ে ভালো,
যদিও ঘুরেছি অনেক প্রান্তরে
জীবনজুড়ে আছে শূন্যতার আলো।
দূরদেশে কত রাজ কাজ
চলে ফেরে মানুষের বিশ্বাসে চরে,
বরং আমি হবো আমার মিষ্টখনি
যদিও গোলাপের পাতা দুঃখেই মরে।

লেখক-
জাহিদুর রহিম
লেখক ও অনুবাদক

প্রকাশিত বই:
কথারা আমার মন, হেমলক সন্ধ্যার গান,
অনুবাদগ্রন্থ: দ্য প্রফেট (মূল: কাহলিল জিবরান)

ভ্রমণ কাহিনী

তামাশার শহরে দুইদিন (প্রথম পর্ব)

মো. রেজাউল করিম

দাপ্তরিক কাজে ব্যাংকক প্রথমবারের মতো আগমন। মাত্র তিনদিনের সভায় অংশগ্রহণ। অবস্থান হোটেল আমারি (Amaree)। অভিজাত পাঁচ তারকাবিশিষ্ট হোটেল। আমারির বেশ কটি শাখা রয়েছে ব্যাংককে। তবে পর্যটকদের প্রিয় এলাকা সই-৫ (Soi5) এর হোটেলটি সদাই জমজমাট।

সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা অবধি সভা। এর পরে ক্লান্ত শরীরে কোথায়ই-বা যাব। তবে বলে রাখা ভাল ব্যাংকক নগরী ইয়াঙ্গুন, কাটমান্ডু বা থিম্পুর মতো নয়। ব্যাংকক নগরীর দ্বিতীয় যাত্রা শুরু হয় বিকেল থেকে। রাত বারটা পর্যন্ত জমজমাট। মধ্যরাতের পরে মানবস্রোতে ভাটা পড়ে। যখন পুব আকাশে ক্ষীণ আলো পৃথিবীর সকল আঁধারকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিজ উপস্থিতি জানান দেয় তখন পর্যটক এলাকাগুলোতে এ নগরীর দ্বিতীয় যাত্রা শেষ হয়।

সভা শেষে ফ্রেশ হয়ে হোটেলের লবিতে এসে বসি। সভায় অশংগ্রহণকারীবৃন্দ এসেছেন এশিয়া, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকা থেকে। সভা চলাকালে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মানুষগুলো এক উদ্দেশ্যে, এক সুরে কথা বলেন। মধ্যাহ্নভোজের সময় হোটেলের রেস্টুরেন্টে কতই না সখ্যতা! কিন্তু সভা শেষ হলে কেউ যেন কাউকে চেনে না। যে যার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়ে যায়।

জগতে আলো-আঁধারের কত-না রূপ-রস-গন্ধ। নিকষ আঁধারও এই জগতে আলোর ঝলকানির সাথে মিলেমিশে একাকার। কখনো-বা আঁধার আবির্ভূত হয় আলোর ঝলকানিতে। এ যেন নাটকের রঙ্গমঞ্চ। পাত্র-পাত্রী সকলেই অভিনয় করছে মাত্র। এই রঙ্গমঞ্চে নিতান্তই একজন সাধারণ মানুষও রাজপোশাক পরিধান করে যা বলছে, করছে, তার বেশিরভাগই হয়ত মেকি। সাজঘর থেকে বেরিয়েই আলংকারিক পোশাক থেকে নিজেকে মুক্ত করে হয়ে যাবেন আবারও একজন সাধারণ মানুষ। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে যা কিছু উপার্জন তা নিজের পরিবারের ক্ষুন্নিবৃত্তিতে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। যা কিছু অবশিষ্ট তা দিয়ে সাজ-সজ্জা মাত্র।

একে তো মুসলিম, তার উপরে রক্ষণশীল মানসিকতার মানুষ আমি। যে কারণে অন্যান্যেরা সভা শেষ হওয়ার পরে আমাকে এড়িয়েই চলে। সভায় আগত আর একজনকে পেয়ে গেলাম আমারই মতো- সালাহউদ্দিন। মনমানসিকতায় আমারই মতো।

প্রথমদিন হোটেলের চারপাশে ঘণ্টা দুয়েক হাঁটলাম আমি আর সালাহউদ্দিন। এলাকার একটা মানচিত্র মানসপটে এঁকে নিলাম। একটি সাইনবোর্ডে ইংরেজির নিচে বাংলা বর্ণ দেখে চোখ আটকে গেল। রাত তখন আটটা। খাবার সময় হয়েছে। রেস্তরাঁয় ঢুকে পড়লাম, খিদমতগারদের চেহারা দেখে মনে হলো, এরা সব বাংলাদেশি। ওরাও আমাদের স্বাস্থ্য চেহারা দেখে যা বোঝার বুঝে গেছে। ম্যানেজারের সাথে কথা বলে জানলাম মালিক বাংলাদেশি। বাড়ি কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায়। হায় হায়, কুষ্টিয়া! আমার জেলার মানুষ সুদূর ব্যাংককে রেস্তরাঁর ব্যবসায় করছেন? সিদ্ধান্ত নিলাম এখানেই রাতের খাবার-পর্ব সারতে হবে। কিন্তু চমকিত হলাম এটি জেনে যে, ম্যানেজারসহ সকল খিদমতগারই পশ্চিমবাংলা থেকে আগত। যেহেতু মালিককে পেলাম না সেহেতু এ রহস্যের উন্মোচন হলো না। তবে পরবর্তীতে বামরুনগ্রাদ হাসপাতাল-সংলগ্ন বাংলাদেশি মালিকানাধীন রেস্তরাঁয়ও দেশি খিদমতগারের দেখা পাইনি। ঐ রেস্তরাঁর খিদমতগারেরা বিভিন্ন দেশের। সেখানে মূলত হাসপাতালে রোগীদের সাথে ভাষাগত যোগাযোগ, ইংরেজিতে যেটাকে বলে কম্যুনিকেশনের জন্য বর্মী, থাই, আরব খিদমতগার কাজ করছেন। বাংলাদেশিদের সাথে কম্যুনিকেশনের জন্য মালিক নিজেই আছেন। পরে অন্য একদিন তিনি অবশ্য অন্য কাহিনি বলেছেন। কতটুকু সত্য জানি না। তিনি বলেছেন, শুরুর দিকে দেশ থেকে লোক এনেছিলেন। তারা গোপনে আইনবহির্ভূতভাবে থাই মুসলিম রমণীকে বিয়ে করায় তাদেরকে জেলখানায় যেতে হয়েছে। এর পরে তাঁকে অনেক তখলিফ পোহাতে হয়েছে। এজন্য গোস্বা করে তিনি স্বদেশীকে নিজ রেস্তরাঁয় চাকরি দেন না।

দুপুরে আমারিতে খেয়েছি থাই ও সাউথ ইন্ডিয়ান খাবারের মিশেল। রাতে পাবদা মাছ, সবজি আর ঘন ডাল দিয়ে মসৃণ চালের ভাত খেলাম। হোটেলের সামনে আসতেই ভারতীয় বসের পাল্লায় পড়লাম। তার সাথে ব্রিটিশ সহকর্মীও রয়েছেন। তিনি আরও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। দুজনই ম্যাসাজ পার্লারে যাওয়ার জন্য চাপাচাপি শুরু করল।

সান্ধ্যকালীন ভ্রমণের শুরুতেই দেখেছিলাম হোটেল আমারির চারপাশে ম্যাসাজ পার্লার। পার্লারগুলোর সামনে ষোড়শী কিংবা অষ্টদশী চঞ্চল বালিকারা কালো রঙের খাটো স্কার্ট ও গোলাপি রঙের পোলো শার্ট পরে 'ম্যাসাজ' লেখা ছোটো একটি বোর্ড বুকের কাছে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সকলেই প্রাণচঞ্চল প্রাণোচ্ছল হাসিতে মাঝে মাঝেই মিষ্টি স্বরে বলছে ম্যাসাজ, ম্যাসাজ।
সারাদিনের সভাশেষে দু'ঘণ্টা হেঁটে ক্লান্ত বটে। রাজ্যের ক্লান্তি যেন গোটা শরীরকে আবৃত করেছে চরম নিষ্ঠুরতায়। বালিকাদের ম্যাসাজে নিশ্চয়ই সে ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। হোটেলে ফিরে উষ্ণ জলে গোসল সেরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে নরম-পেলব বিছানায় গা এলিয়ে দিলেই দু'চোখে ভর করবে নিদ্রাদেবী।

হা-হা- কল্পনা বটে। বসকে আমার অসম্মতির কথা জানালাম। বস বলল মাত্র দশ ডলার (আট শ চল্লিশ টাকা)। 'রেজা ভাই, আই উইল পে দিস। হোয়াই ডু ইউ ফিল শাই? অল দিজ আর 'নো সেক্স' ম্যাসাজ পার্লার, হারি প্লিজ। আই উইল নট শেয়ার ইট উইথ ভাবী। লেটস গো।'
আবারও আমার অস্বীকৃতি। সত্যি এ লজ্জাকর বিষয়। যদিও এগুলো সত্যিই 'নো সেক্স' ম্যাসাজ পার্লার, কিন্তু মনের গহনে সযতনে সুরক্ষিত মূল্যবোধ আর লজ্জা দুয়ের মিশেলে পুনঃঅস্বীকৃতি। পশ্চিমা সংস্কৃতির মানুষ ডেভিড হয়ত বুঝেই উঠতে পারছে না কেন এই অস্বীকৃতি। ও শুধু একবারই ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল 'ইটস ড্যাম চিপ। ইন লন্ডন ম্যাসাজ ফি উল বি অ্যাট লিস্ট ফিফটি ডলার (সাড়ে চার হাজার টাকা)।' বস আমার হাল ছেড়ে দিয়ে বিরক্তিভরা মুখাবয়বে ডেভিডকে নিয়ে চলে গেল।

পরদিন আমি আর সালাহউদ্দিন বিকেলে ট্যাক্সিতে চেপে গেলাম এমবিকে শপিং মলে। সালাহউদ্দিন ব্যাংককে এবারই প্রথম। ব্যাংকক শহরের প্রধান সকল সড়কেই রাস্তার ওপরে ফ্লাইওভার। কোনো কোনো সড়কে তারও ওপরে মেট্রোরেল নামধারী 'আকাশ রেল'। প্রতি দু-তিন মিনিট পর-পর আসছে। মানুষ মেশিনে কয়েন ফেলে টিকেট নিচ্ছে। কয়েন না থাকলে আর এক মেশিন রয়েছে। সেখানে কাগজের নোট ফেলে দিলে কয়েন বেরিয়ে আসছে। বিদ্যুৎচালিত রেলগাড়ি বোধ হয় এক স্টেশনে আধা মিনিট কী তার চেয়েও কম সময় দাঁড়াচ্ছে। প্রশস্ত দরজা দিয়ে দুই সারিতে ওঠা-নামা। ওঠার সময় খেয়াল রাখতে হবে প্লাটফর্মে হলুদ দাগের এপারে আছি কিনা! অনেক বেশি প্রয়োজন? দু'মিনিট এর জন্য তর সইছে না? পা হলুদ দাগের ওপারে? ঢাকায় যা করেন এখানেও তাই করতে চান? লম্ফ দিয়ে উঠে পড়বেন? না মশাই- জীবনটাই হারাতে হবে। ও কর্ম্ম কস্মিনকালে করতে যাবেন না। সমস্যা হচ্ছে স্টেশনে ও রেলগাড়ির ভেতরে সকল ঘোষণাই থাই ভাষায়। এক ধরনের ভয়মিশ্রিত অ্যাডভেঞ্চারিজম নিয়ে আকাশ রেলে চড়ে বসলাম। থাইদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই ইংরেজি জানে। আমরা তিন স্টেশন যাওয়ার টিকেট কিনেছি। গুনেগুনে তৃতীয় স্টেশনেই নেমে পড়লাম। সেখান থেকে ট্যাক্সিতে করে সই-৫ এ ফিরে এলাম। বাসে আসলে বেশ কিছু পয়সা বেঁচে যেত। কিন্তু ভাষাগত সমস্যার কারণে সে সিদ্ধান্ত প্রথমেই বাদ।

সই-৫ এলাকাতে এসে হেঁটেই হোটেলে ফিরলাম। প্রশস্ত ফুটপাত ধরে দুজনে চললাম হোটেল অভিমুখে। সই-৫ পর্যটকদের এলাকা। যে কারণে ওখানকার ফুটপাতের বেশিরভাগ অংশই ঢাকা শহরের ফুটপাতের মতো হকারদের দখলে। কিন্তু ব্যাংকক নগরীর অবশিষ্ট অংশের ফুটপাত পথচারী-বান্ধব। ভাঙাচোরা, ধুলো-ময়লাও নেই। গোটা শহরেই ওরা মাটিকে ঢেকে ফেলেছে। সড়কের দু'পাশের মৃত্তিকা স্তর সড়ক কিংবা ফুটপাত দিয়ে আবৃত। তাই বলে শহর যে সবুজহীন তা নয়। ফ্লাইওভারের স্তম্ভগুলো কার্পেট-লতায় আবৃত। সরকারি-বেসরকারি দপ্তরগুলোর সামনে সবুজ লন। আবাসিক এলাকাতে ভবনগুলোর চারপাশেও বৃক্ষের সমারোহ দেখা যায়।

পথ চলতে চলতে আমি ও সালাউদ্দিন দুজনই একে অপরের মনের সুপ্ত বাসনা আবিষ্কার করে ফেললাম। এবারে আমি যেমন ভ্রমণের জন্য দু'দিন ছুটি নিয়ে এসেছি, সালাহউদ্দিনও তেমনি। তবে সালাহউদ্দিন এককাঠি সরেস। তার ইচ্ছে পর্যটন নগরী পাতাইয়া ভ্রমণ। আমিও চিন্তা করে দেখলাম, ভবিষ্যতে আবারও হয়ত ব্যাংকক আসা হবে। কিন্তু পাতাইয়া যাওয়ার সুযোগ নাও মিলতে পারে। আঁইগুই না করে সাথে-সাথেই মত দিয়ে দিলাম- আমিও যাব।

ব্যাংকক নয় বরং পর্যটন নগরী হিসেবে গোটা বিশ্বে খুবই পরিচিত থাইল্যান্ডের পাতাইয়া ও ফুকেট। পাতাইয়া সাগরতটে পর্যটন নগরী। মাত্র দেড় ঘণ্টার রাস্তা। ফুকেট দ্বীপ। আকাশপথেই সাধারণত পর্যটকেরা সেখানে যায়। তবে পাতাইয়া থেকে সাগরপথেও যাওয়া যায়।

বলতে দ্বিধা নেই বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে পাতাইয়া 'সেক্স সিটি' হিসেবেই পরিচিত। তার অর্থ এই নয় যে, সেখানে পর্যটনের অন্য কোনো উদ্দেশ্য ও উপকরণ নেই। প্রচুর পর্যটক আসেন পাতাইয়া সাগরসৈকতের সৌন্দর্য দেখতে। অনেক নবদম্পতিকেও দেখেছি পাতাইয়া সাগরসৈকতে, ওদের দু-একজনের সাথে কথাও হয়েছে। তবে ল্যাটিন আমেরিকান, এমনকি আমেরিকান নাগরিকরাও বাংলাদেশকে চিনতে পারেনি। আমেরিকানদের ভৌগোলিক জ্ঞান আমার কাছে কম বলেই মনে হয়েছে।

সই-৫ এলাকাতে রাতের খাবার খেয়ে নিলাম। একটা লেনে বেশ কিছু রেস্টুরেন্টে। এর মধ্যে 'আল-সালাম' নামে একটা রেস্টুরেন্টও দেখলাম। সম্ভবত ভারতীয় বা পাকিস্তানি রেস্টুরেন্ট। না, আল-সালামে নয় এক লেবাননি রেস্টুরেন্টে বসলাম, উদ্দেশ্য ভিন্ন ধরনের খাবারের স্বাদ গ্রহণ। লেবাননি নান। সবজি ও চিকেন কাবাবের মেন্যুতে টিক দিলাম। মনে বেশ উত্তেজনা। হোটেলে গিয়েই পাতাইয়াতে হোটেল বুকিং দিতে হবে।

লেবাননি রেস্টুরেন্টে ঢুকে যে খুব ভিন্ন কোনো খাবারের স্বাদ পেলাম, তা নয়। নান একটু মিষ্টি মিষ্টি। সবজি খুবই উপাদেয়। বলাবাহুল্য খিদমতগারের পরামর্শেই সবজির এই পদ নির্বাচন করা হয়েছিল। মুরগির কাবাবও সুস্বাদু- অনেকটা সাসলিকের মতো।

সালাহউদ্দিনের ল্যাপটপে দুজনে মিলে পাতাইয়ার সুবিধাজনক হোটেল খুঁজতে গিয়ে যা বুঝলাম তা হচ্ছে, সেখানকার সাধারণ হোটেলের ভাড়া বেশ চড়া, ব্যাংককের তুলনায়ও বেশি। হোটেলগুলোতে দু'ধরনের কক্ষের সমাহার বেশি। টুইন বেড অথবা মাস্টার বেড। টুইন বেডের কক্ষে একজন অথবা দুজনের থাকা বাবদ ভাড়া একই। তবে পরিষ্কার নির্দেশনা রয়েছে, টুইন বেড বা মাস্টার বেডের কক্ষ একজন ভাড়া নিয়ে ভাড়া করা সঙ্গিনীকে কক্ষে কিছুক্ষণের জন্য আনলেও দুজনের ভাড়াই দিতে হবে।

সাগরসৈকতের কাছে ছোটো একটি হোটেল পছন্দ হলো তুলনামূলক সাশ্রয়ী মূল্যের জন্য। ইন্টারনেটে পাসপোর্টের স্ক্যান কপি জমা দিয়ে বুকিং দেয়ার পাঁচ মিনিটের মাথায় একটি টুইন বেডের কক্ষ পাওয়া গেল। আগামীকালসহ দু'রাত থাকব। প্রতিদিনের ভাড়া চার হাজার টাকা। অগ্রিম চাইল। জানালাম আমাদের ক্রেডিট কার্ড নেই। সাথে সাথেই জানানো হলো, সেক্ষেত্রে বুকিং নেয়া হলো কিন্তু নিশ্চিত না। উপরন্তু আমরা পৌঁছাব সন্ধ্যায়। সুতরাং বিশ্বাস কী? টেলিফোন করলাম। চেষ্টার কসুর করলাম না বোঝাতে যে, সুদূর বাংলা মুলুকের দুজন মানুষ পাতাইয়া ভ্রমণের ব্যাপারে পুরোপুরি সৎ ও আন্তরিক। কিন্তু তারা আগের কথার পুনরাবৃত্তিই করল।

দুজনে সিদ্ধান্ত নিলাম, যাব। ব্যাগ মাথায় করে হলেও হোটেল খুঁজে বের করব যদি বুকিং ওরা বাতিলই করে দেয়। হোটেল যদি না-ই পাওয়া যায়, তাহলে সাগরসৈকতের চেয়ার ভাড়া করে রাতটা কাটিয়ে দেব। পাতাইয়া সিটি কর্পোরেশন ওয়েবসাইটে পর্যটকদের জন্য বেশ কিছু বিষয়ে সাবধান বাণী-সম্বলিত নির্দেশনা দিয়ে রেখেছে। সেখানেই জানা গেল সাগরসৈকত গোটা রাত উন্মুক্ত এবং সশস্ত্র পুলিশ নিরস্ত্র পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধান করে। সুতরাং চিন্তার কিছু নেই।

তৃতীয় দিন দুপুর চারটায় সভা শেষ হয়ে গেল। বসকে জানালাম ব্যাংককেই বাঙালি বন্ধুর বাসায় থাকব। পাতাইয়া যাওয়ার খবর পুরো চেপে গেলাম। তিনিও তাঁর ভারতীয় বন্ধুর বাসায় দু'দিন থাকবেন বলে জানালেন। সালাহউদ্দিন ও আমি পড়িমরি করে ট্যাক্সি নিয়ে বাসস্ট্যান্ড অভিমুখে ছুটলাম। ব্যাংকক পাতাইয়া সড়কে সারারাতই বাস এমনকি ট্যাক্সিও চলে। মূল্য সাশ্রয়ী বাসেই চেপে বসলাম। ছ'টা ত্রিশে পাতাইয়া পৌঁছে গেলাম। পাতাইয়া পৌঁছেই বুঝলাম ব্যাংককের সাথে একে মেলানো যাবে না। বাস থেকে পাতাইয়ার মাটিতে পা ফেলতেই হোটেল ও মক্ষিরাণিদের সেলস এজেন্ট তথা দালালরা ঘিরে ধরল।

একটা 'টুকটুক' (অনেকটাই আমাদের দেশের মফস্বল শহরগুলোতে চালু ইজিবাইকের মতো) ধরলাম। টুকটুক-চালক ভাড়া প্রদর্শন করলেন ক্যালকুলেটরে। উচ্চারণগত ভিন্নতার জন্য ভুল বোঝাবুঝি নিরসনে ব্যাংককের সর্বত্রই এ প্রথা দেখেছি। গ্রহণযোগ্য ভাড়াই মনে হলো।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন না কি অপ্রসন্ন বুঝে উঠতে সময় লাগল। আমাদের বুকিংকৃত কক্ষ এখনো ভাড়া হয়নি। সুতরাং রাস্তায় রাস্তায় পদব্রজে ঘোরাঘুরি কিংবা সাগরসৈকতে নিশিযাপন কোনোটারই প্রয়োজন হবে না। নিবন্ধন খাতায় ঠিকুজি লিখে নির্ধারিত কক্ষে প্রবেশ করেই হতাশ হয়ে পড়লাম। ইন্টারনেটে প্রদর্শিত ছবির সাথে কক্ষের বাস্তব অবয়বের সাদৃশ্য একেবারেই নেই। স্বল্পালোকিত কক্ষ- একটিমাত্র বাল্ব কক্ষটিতে। দেয়ালের গোলাপি রঙ সম্ভবত কয়েক বছরের পুরনো হবে। জানালার পর্দার সুরতও তথৈবচ। উদ্বেগজনক যা- তা হচ্ছে দুটি খাটের চাদরেই ছিদ্র। হাম্মামখানাও অপরিষ্কার। সম্ভবত আজকে পরিষ্কারই করা হয়নি- ধূমপায়ীদের বদঅভ্যাসের খেসারত আমাদের দিতে হবে।

হাম্মামখানার মেঝেতে ও বেসিনে ধূমকাঠির অবশিষ্টাংশ পড়ে রয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আবদ্ধ কক্ষে ধূমপানের ফলে কক্ষের পরিবেশ যেমন হওয়ার কথা তেমনই। পূর্বতন অতিথি বিদেয় হওয়ার পরে বায়ু-পরিষ্কারক সুগন্ধি স্প্রে করা হয়নি। ফলে কক্ষটির পরিবেশ গুমোট ও দুর্গন্ধযুক্ত। খিদমতগার ইংরেজি বোঝে না। সে ওয়াকিটকিতে ফ্রন্টডেস্কে কথা বলল। তাকে নিয়ে অভ্যর্থনা কক্ষে গেলাম। আমাদেরকে দেখে অর্ভ্যথনা কক্ষের ফ্রন্টডেস্কে বসা সুহাসিনীর হাসি অপসৃয়মান। কেমন যেন রুক্ষ-রুষ্ট ভাব নিয়ে তাকাল আমাদের দিকে। আমরা সমস্যাগুলো বললাম। তিনি জানালেন, চাদর পাল্টে দেয়া হবে, ঘরে এয়ারফ্রেশনার দেয়া হবে। কিন্তু হাম্মামখানা আজ পরিষ্কার করা যাবে না-কাল। আমার জিদ তাকে জানিয়ে দিলাম। হাম্মামখানা পরিষ্কার করে না দিলে আমরা বুকিং বাতিল করব। সাথে সাথে বুঝলাম এদেশ নেপাল, ভুটান, এমনকি মায়ানমারও নয়। এদেশের নাম শ্যামদেশ ওরফে থাইল্যান্ড।

তরুণী জানালেন, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে পুরো ভাড়া দিয়েই যেতে হবে। কিছুটা উত্তেজিত হয়েই বললাম, একটা আন্তর্জাতিক পর্যটন নগরীর হোটেলে হাম্মামখানার মতো একটা স্পর্শকাতর জায়গা পরিষ্কার না করে ভাড়া দেয়াটা কতটা যৌক্তিক। তিনি নিরুত্তর। আবারও ব্যবস্থা করে দিতে বললাম। সামনের সোফাতে যে দুজন ষণ্ডামার্কা চেহারার যুবক বসেছিল তারাও উঠে এসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে তরুণীর পক্ষ নিয়ে কথা বলা শুরু করল। আমি সোজা-সাপটা কানুনের আশ্রয় নিতে চাইলাম। মোবাইল ফোনে পাতাইয়া পুলিশের এসএমএস দেখিয়ে বললাম, 'আমি কি এখানে কল দিব?'

ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হতে পারত ভয়ঙ্কর। কিন্তু না। ষণ্ডামার্কা দুই যুবক পিছিয়ে গিয়ে সোফাতে বসল। তরুণী বললেন, আমরা যখন রাতের খাবারের জন্য বাইরে যাব তখন হাম্মামখানা পরিষ্কার করে দেয়া হবে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া দরকার ছিল। কিন্তু এমনতরো নোংরা বিছানায় বিশ্রাম নিতে মন কি চায়! কাপড়-চোপড় পাল্টে হোটেল থেকে বের হয়ে পড়লাম। কাছেই দেখা যায় পাতাইয়া সৈকত- তখনও জমজমাট। দূরে কেমন একটা নরম মায়াবী আলোছায়া। কে যেন ডাকে! জানি না কোন সে কুহকিনী। পাহাড় নাকি সাগর। দুটোই আমার প্রিয়। দেখা হলেই ওদের মাঝে অবগাহন করতে মন চায়। হায় কত কত দিন পর ওদের দেখি! শুষ্ক-সমতলের মানুষ বলেই কি বিপরীত প্রকৃতি-পাহাড় আর সাগরের প্রতি আমার প্রেম? যা সহজেই পাওয়া যায় তার প্রতি প্রেম হয় বুঝি-বা নরম। আর যা সহজে পাওয়া যায় না, তার প্রতি প্রেম হয় অদম্য-অতলস্পর্শী-অতিপ্রাকৃত। উপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করলাম। ওয়াকিং স্ট্রিট অভিমুখে চললাম। পাতাইয়া নগরীতে আসার আগে ইন্টারনেটে এই সড়কের কথা অনেক পড়েছি। প্রতিটি সাইটেই পর্যটকদেরকে এই সড়কে আসার ব্যাপারে খুব উৎসাহিত করা হয়েছে।

যথেষ্ট প্রশস্ত সড়ক। ফুটপাতও বেশ প্রশস্ত। সড়কের দু'পাশে স্থানীয় ঐহিত্যবাহী পণ্যের দোকান। বার, ম্যাসাজ পারলার। রেস্টুরেন্টও রয়েছে। ইউরোপিয়ান পর্যটকেরা সাধারণত বিদেশে আমাদের মতো কাপড়-চোপড় কেনাকাটা করে না। তারা ছোটোখাটো স্যুভেনির কেনে। দোকানগুলোতে তাদের বিচরণ চোখে পড়ার মতো। তবে ব্যাংককে যা দেখিনি এ নগরীতে তা দেখে বেশ ভড়কে গেলাম। দলবদ্ধ ভারতীয় যুবকদলের হৈ-হুল্লোড় থেকে ব্যবধান রেখেই ধীরে সুস্থে বেশ খানিকক্ষণ হাঁটলাম। হেঁটে হেঁটে এশিয়ার অন্যতম আলোচিত-সমালোচিত এই নগরী সম্পর্কে ধারণা নেয়ার চেষ্টা করলাম।

প্রচুর শেতাঙ্গ পর্যটক। তাদের বেশির ভাগই থাই-যুবতীকে বগলদাবা করে ঘুরছে। বয়সে ওরা মধ্যবয়স্ক কিংবা পৌঢ়। ব্যাংককে আরবদেশীয়দের দেখা গেলেও এখানে চোখে পড়ল না। তবে ভারতীয় ও শ্রীলংকান পর্যটকদের বেশিরভাগই যুবক। তারা তিন-পাঁচ কিংবা আট-দশ জনর দলবদ্ধভাবে হৈ-হল্লা করে ওয়াকিং স্ট্রিট চষে বেড়াচ্ছে।

বাদামি চামড়ার এই-দুই আদমিকে দেখে দলগুলোর কেউ কেউ চোখ বড়ো করে আমাদের দিকে তাকাতেই 'দেখিনি' এমন ভাব করে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। পদযুগল আগাম হুঁশিয়ারি বার্তা দিল চঞ্চল বিচলনে তার অনিচ্ছার ব্যাপারে। কাছাকাছি একটা দক্ষিণ-ভারতীয় রসুইঘর পেয়ে গেলাম। রাতের বেলা ভাত খাই। তবে সুযোগ পেলে রুটিও খাই। এখানে নান বা তন্দুরী নেই। আছে হাতে বেলা রুটি। নিরামিষাশী বলতেই ভারতীয় খিদমতগার মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল। মিনিট দশেক পরে স্টেইনলেস স্টিলের থালা নিয়ে হাজির। থালার মাঝখানে কাঁচা লাল আটার রুটি, চারপাশে ছোটো ছোটো কাঁসার বাটিতে নানা পদের তরকারি ও আচার। পেট পুরেই খেলাম।

দশটা নাগাদ হোটেলে ফিরলাম। কক্ষে ঢুকে কিছুটা স্বস্তিই অনুভব করলাম। হাম্মামখানা পরিষ্কার করা হয়েছে। ঘরের দুর্গন্ধ পুরোপুরি উবে যায়নি, তবে বসবাসোপযোগী। ঘরের বাইরে গেলেই আমার ঝোলাতে কাপড়-চোপড়ের নিচে পাতলা একটি চাদর থাকে। সেটির সদ্ব্যবহার করতে কসুর করলাম না। আমার এই বিকল্প ব্যবস্থা দেখে সালাহউদ্দিনকে স্বল্পমাত্রায় ঈর্ষান্বিতই মনে হলো।

ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হয়। কেননা কমপ্লিন্টারি ব্রেকফাস্ট দেয়া হয়। বরাবরই সকালের নাস্তা সেরেই ঘর থেকে বাইরে বেরোনো অভ্যেস। আমাদের দেশের বড়ো শহরগুলোতে কমপ্লিন্টারি ব্রেকফাস্টে সাধারণত অপশন থাকে দেশি ও বিদেশি, যাকে বলে কন্টিনেন্টাল নাকি ইংলিশ। এখানে কোনো অপশন নেই। শুধুমাত্র ইংলিশ- ব্রেড টোস্ট, জেলি, বাটার ও অমলেট।

ব্যাংককেও শ্বেতাঙ্গরা থাই তরুণীদের বগলদাবা করে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ওখানে ভারতীয়দের দৌরাত্ম্য চোখে পড়েনি এ নগরীর মতো। এখানে ভারতীয়রা যতটা না থাই তরুণী বগলদাবা করে, তার চেয়ে বেশি শ্বেতাঙ্গদেরকে বগলদাবা করে হোটেলে আসছে। এই শ্বেতাঙ্গ রমণীরা রুশদেশীয় নামে পরিচিত হলেও মূলত পূর্ব-ইউরোপিয়ান। সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পূর্ব-ইউরোপে শরীরী ব্যবসা নিষিদ্ধ ছিল। সেসময়ে তাদের ঐশ্বর্য ছিল না কিন্তু ন্যূনতম চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল। তাদের তা পছন্দ হলো না। তারা গণতন্ত্রের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গণতন্ত্র পেল। এখন কিছু মানুষের সমৃদ্ধি আকাশছোঁয়া। আর কিছু জমিনের অভ্যন্তরে ধাবমান। এদেরই কিছু তরুণী সমৃদ্ধির মরীচিকার পেছনে ছুটতে ছুটতে পশ্চিম ইউরোপ আমেরিকা এমনকি সুদূর এশিয়ার থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনেও উড়ে এসেছে।

চলবে...

লেখক-
মো. রেজাউল করিম
স্নাতকোত্তর- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল ও পরিবেশবিজ্ঞান (প্রথম শ্রেণি, ১৯৮৮)

প্রকাশিত বইঃ
ভাষা আন্দোলনে ফরিদপুরে ও ইতিহাস ও স্থাপত্য ঐতিহ্যের নগরী ঢাকাসহ আরো ১৪টি।
প্রথম কাব্যগ্রন্থ -'**তোমার খোঁজে**'

গল্প

ফেরা

মোঃ তানিম-উল-ইসলাম

উচ্চতা ভীতিতে আক্রান্ত মহিম ট্রেনের ছাদে বসে আছে! জীবনে কিছু কিছু মুহূর্ত আসে যখন বোকা মানুষ চালাক হয়, ভীতু মানুষ সাহসী হয়। মহিম এমন কোনো মুহূর্তের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে কিনা তা বলার আগে আমি আপনাদের পেছনের একটা গল্প শোনাই। তার আগে বলে নেই: "রিনির আজ বিয়ে!"

খুব বেশি আগের ঘটনা না। এবং আমি আপনাদের যে ঘটনা বলবো সেটাও যে আনকমন কিছু তাও কিন্তু না। অনেকের জীবনেই এমনটা ঘটে। আচ্ছা একটু মিলিয়ে নিন তো!

বিশ্ববিদ্যালয়ে ওঠা মহিমের হঠাৎ খেয়াল হলো জিম করার। যেই ভাবা সেই কাজ। বাড়ির ছাদটাকেই বানিয়ে ফেললো জিম। নিয়ম করে সকাল সন্ধ্যা সেখানেই নানা রকমের কসরত চলতে লাগলো। তো এমনি কোন এক বিকেলে মহিমের সাথে দেখা হয়ে যায় আমাদের গল্পের রিনির! দেখা হওয়া মাত্রই প্রেম, ব্যাপারটা কিন্তু তা না। কিন্তু এটা যদি নাও বলি, সত্য বলা হবে; ঘটনা কিন্তু তাও না! আপনি দেখবেন আপনার কিছু অনুভূতির উৎস আপনি নিজেও জানেন না। কেন হয়, কিভাবে হয়, কি হয়; এই এতসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আপনার মাথা খারাপের মত হয়ে যায়। তো যা বলছিলাম, সেদিন রিনির ছিল বার্থডে। মহিম রিনির পাশাপাশি ছাদ। পাশাপাশি ছাদ হতেই পারে তবে পাশের ছাদের একটা মেয়ে বান্ধবীদের নিয়ে মহিমেরই পছন্দের নজরুল সঙ্গীত গাইবে এটা বোধহয় নাও হতে পারতো। কিন্তু যা হবার তা আপনি আটকাবেন কিভাবে!

আচ্ছা এ ছাদের ঘটনা থেকে আমরা আবার একটু মহিমের ট্রেনের ছাদে ফিরে আসি। সাঁই সাঁই করে ট্রেন চলছে। মহিম আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। একটু ভাল করে যদি দেখেন আপনি দেখতে পাবেন মহিম কাঁদছে। কিন্তু জানেন সে শেষ কবে কেঁদেছে?

জন্ম থকেই তার মুখে কথা বাধে। আমরা যাকে তোতলা বলি মহিম ঠিক তাই। এটা নিয়ে মহিমের পরিবারের কোন মাথা ব্যথাই ছিল না। সবাইকে যে সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে বাংলাদেশের সংবিধানে এমনতো কোন অনুচ্ছেদ নাই, তাই না! মহিম তখন ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, কলেজে এসেছে রসায়নের নতুন টিচার। এই টিচার শরীরে যেমনি মোটা, তার হাতে ধরা বেতগুলোর সাইজও তেমনি মোটা।ঘটনা ঘটলো মহিমদের ক্লাসে, স্বয়ং মহিমের সাথেই! রগচটা জব্বার আলী ক্লাসে ঢুকেই মহিমকে গতক্লাসের পড়া থেকে পড়া ধরে। মহিম দাঁড়িয়ে রীতিমতো তোতলাতে থাকে। ব্যাস জব্বার আলীকে আর পায় কে! সপাৎ সপাৎ করে মহিমের পশ্চাৎদেশে বেতের কয়েকটা ঘা বসিয়ে দেন জব্বার আলী। এরকম ঘা মহিম এ জীবনে কম খায়নি, কিন্তু ঘাটা সে যেখানে খেয়েছে এবং যেমন করে খেয়েছে তা ভাবতেই মহিমের কান্না পায়। সেই রাতে মহিম কতো কেঁদেছে তা জানে মহিমের সৃষ্টিকর্তা আর জানে তার বালিশ!

যাইহোক এবার মূল ঘটনায় প্রবেশ করি। তার আগে ছোট্ট একটা কথা বলে নেই। আপনাদের জীবনে কখনো কি এমন হয়েছে- যেটাকে ভেবেছেন আপনার জীবনের সবচেয়ে দুর্বল দিক সেটাই হয়ে ওঠেছে আপনার জীবনের উপরে ওঠার সিঁড়ি! মহিমের তোতলানোকেই রিনি ভালবেসে ফেলে। ভালবাসা এক অদ্ভুত ব্যাপার স্যাপার। এখানে কখন কী হয়ে যায় বলা মুশকিল। তো মহিম-রিনির ভালবাসা ভালোই চলছিল। দুজনের মাথায় ঘুরছিল তখন নানা ধরনের প্ল্যান।

এই করবে, সেই করবে, জগৎ তারা পাল্টে দেবে। মহিম জগৎ পাল্টাতে পেরেছিল কিনা জানি না, তবে তার রেজাল্ট যে পাল্টে গিয়েছিল সেইটা বলতে পারি। পড়াশোনা তার আর ভাল লাগছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসগুলোকে তার মনে হতো ময়লা ফেলার ডাস্টবিন। মহিমের খুব কষ্ট হত- কেনই সে রিনির তিন বছর আগে পৃথিবীতে এসেছে! তা না হলে তো আজ একসাথে পড়া যেত।

গল্পটা মনে হচ্ছে 'লুতুপুতু' 'পুতুপুতু' টাইপ হয়ে যাচ্ছে তাই না! আমাকে এ ব্লেইম থেকে বাঁচাতেই বোধহয় রিনির জীবনে আবির্ভাব ঘটে রাতুলের! একটু আগেই কিন্তু বলেছি- ভালবাসা ব্যাপারটা অদ্ভুত। আর কালজয়ী ঔপন্যাসিক জহির রায়হানতো স্রেফ বলেই দিয়েছেন: ভালোবাসা জীবনে একবার আসে না, দুইবার আসে না, তিনবারও আসে না। সে আসে শত শত বার।

রিনি আবারো প্রেমে পড়ে যায়। প্রেমে পড়ে তারই ক্লাসমেইটের বড় ভাই রাতুলের সাথে। রাতুল তখন ভাল চাকরি করতো। বান্ধবীর বাসায় যাওয়া আসার মাঝেই রাতুলের সাথে কথা। কথা শুনেই রিনির ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। একটা মানুষ এত সুন্দর করে কথা বলতে পারে! হয়তো মহিমের তোতলানো কথা শুনতে শুনতে রিনি তখন ক্লান্ত। আর এভাবেই যা হবার তাই হলো। রিনি রাতুলের নতুন প্রেম আমাদের গল্পের মহিমকে দূরে সরিয়ে দিতে লাগলো। এতোটাই দূরে, মহিমও শেষ পর্যন্ত বুঝে যায় তার জীবন থেকে রিনি নামের মেয়েটা হারিয়ে যেতে বসেছে। মহিম অবশ্য গত কয়েকমাসে অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলেছে। রিনিকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে করতে জিম করা ভুলে গেছে, মা বাবার শাসন বারণ ভুলে গেছে। ভুলে গেছে- ক্লাসে কিভাবে ফার্স্ট হতে হয়!

তো আগেই বলেছি, রিনির আজ বিয়ে। বুঝতেই পারছেন বিয়েটা কার সাথে হচ্ছে। গত দুইদিন আগে মহিমের সাথে রিনির লাস্ট কথা হয়। রিনি কান্না জড়ানো কণ্ঠে বারবার বলে- মহিম যেন নিজের প্রতি যত্ন নেয়, সে যেন একটুখানি ভাল করে পড়াশোনা করে। রিনির কথা শুনে মহিম শুধু হেসেছে। মহিমের হাসি দেখে রিনি জানতে চায় তার কারণ। মহিম আবারো হাসে। হাসি দিয়েই প্রকাশ করে মহিম তার হাসির কারণ। রেস্টুরেন্টের আলো আঁধারি ছেড়ে, মহিমকে একা রেখে রিনি যখন চলে যাচ্ছিল তখনই মহিম সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় আজকের এ দিনটার!

ট্রেন চলছে! মহিমের চুল বাতাসে উড়ছে। পকেটে মোবাইল ফোন বাজে। সে সেলফোনটা বের করে নিচে ফেলে দেয়। জীবনটাই আর রাখতে চাচ্ছে না মহিম, ফোন রেখে হবে কী! মহিম আস্তে-ধীরে উঠে দাঁড়ায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। এখন তাকে একটা লাফ দিতে হবে। মহিমও প্রস্তুত। কিন্তু হঠাৎ সে বুঝতে পারে ট্রেনের গতি কমে গেছে। ছোট্ট একটা স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে। সামনের স্টেশনে যাওয়ার আগেই তাকে ওপরে যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে মনে মনে ঠিক করে নেয় মহিম! আর ঠিক কোন জায়গাটা দিয়ে লাফ দিবে তাও বেছে নেয় সে।

ট্রেন থেমে আছে। জীর্ণশীর্ণ একটা স্টেশন। সে ছাদ থেকে নেমে স্টেশনের সামনে চায়ের টং দোকানটায় গিয়ে বসে। তার বিকেলের সেই মন খারাপটা এখন আর নেই। হয়তো জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে আছে বলেই মনটা কেমন ফুরফুরে হয়ে আছে।
মহিমের পাশে বসে আছে সাদা লুঙ্গি পড়া মাঝবয়েসী এক লোক। লোকটার বোধহয় চুলকানি রোগ আছে। একটু পরপর লোকটা লুঙ্গির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে জোরে জোরে চুলকায়। চুলকানোর সময় আরামে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসে। মহিম লোকটার পাশ থেকে উঠে অন্যপাশের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে। দোকানী চা এগিয়ে দিয়ে সাদা লুঙ্গি ওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে- 'লাশ আইবো কহন?' সাদা লুঙ্গি এখনো কথা বলে না। সে বোধকরি চুলকানোর ফাইনাল স্টেজে আছে। ঠিক এমন সময় চায়ের দোকানের পাশে যে বিশাল বটগাছটা আছে সেখান থেকে কান্নার মাতম শোনা যায়। সাদা লুঙ্গিওয়ালা এবার উঠে দাঁড়ায়। চায়ের কাপটা দোকানীকে দিয়ে বলে- 'রফিকের মায় সব জাইনা গেছে। আমি কইছিলাম বুড়িরে কিছু কওয়ার দরকার নাই। লাশ আইলে পরে বুঝায়া কমুনে, না তাগো কইতেই হইবো। সামলাও, এহন বুড়িরে সামলাও।'

বলতে বলতে সাদা লুঙ্গি সামনের দিকে হাঁটা দেয়। মহিমও তার পিছু নেয়। সামনে জটলার কাছে যেতেই কালো মতোন এক বলশালী লোক মহিমকে জিজ্ঞেস করে- 'আপনে কি সাংবাদিক?' মহিম কিছু বলার আগেই লোকটা আবারো বলে- 'কারখানার আগুনে পুইড়া মরছে নাকি হেগোরে পুড়ায়া মারছে হেইডা আমরা সবই জানি। তয় মনে রাইখেন, এইবার এর একটা বিহিদ না কইরা ছাড়তাছি না।' মহিম দেখতে পায় ট্রেনের বগি থেকে কাঠের একটা বাক্স নামানো হচ্ছে। তাকে কেউ বলে দেয়নি কিন্তু মহিম বুঝে গেছে বাক্সের ভেতরে কী আছে!

কফিন নামাতেই প্রলাপ বকতে বকতে ছুটে আসেন একজন বৃদ্ধা মহিলা। আমার মানিকরে, আমার সোনারে বলে চিৎকার করে কাঁদছেন একজন মা। সে এক গগনবিদারী কান্না। এরই মাঝে কিছু লোকজন এসে জড়ো হয়। তাদের কারো কারো হাতে লাঠি, শাবল, কুড়াল। বেশ কয়েকজন ট্রেনের একটা বগিতে গিয়ে হামলা চালায়। মহিম বুঝে ফেলে তার মৃত্যু সিদ্ধান্ত আজ কার্যকর হচ্ছে না। হলেও, এ ট্রেন থেকে তার আর লাফ দেয়া হচ্ছে না!

মহিমের কান্নাকাটি ভাল লাগে না। সে আস্তে-ধীরে জটলা ছেড়ে সামনের দিকে এগুতে থাকে। ঘণ্টা আধেক হাঁটার পরে সে একটা পুকুরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। হাতে পড়া ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে সময় তখন রাত আটটা। এতোক্ষণে রিনির বিয়ে হয়ে যাবার কথা। বাসরে যাবার প্রস্তুতিও বোধহয় শেষ। আহ! এতো যন্ত্রণা কেন! মহিম এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চায়। পানিতে ডুবেই আজ সে সকল ব্যথা থেকে নিজেকে মুক্তি দিবে!

আকাশে তখন বিশাল এক চাঁদ উঠেছে। মহিম কিছুক্ষণ চাঁদের দিকে তাকায়। হঠাৎই তার মনে হলো- কষ্ট বেশি কার? মহিমের নাকি ওই মায়ের? যার ছেলে আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে তার থেকেও কি মহিমের কষ্ট বেশি! আচ্ছা তার মাও কি এভাবে কাঁদবে না? ভাবতে ভাবতেই হঠাৎই তার সবকিছু ওলট-পালট মনে হয়। ওলট-পালট মাথা নিয়ে আবারো সে আকাশে চোখ রাখে। চাঁদটা তখন মেঘের আড়ালে। কিন্তু মহিমের মনের মেঘ বুঝি কেটে যাচ্ছে! সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। খুব পানির তেষ্টা পেয়েছে তার। তার চেয়েও তেষ্টা পেয়েছে মায়ের সাথে কথা বলার! মহিম খুব দেরিতে হলেও বুঝে ফেলে- তার পাশে থাকা মানুষগুলোর সত্যিকারের ভালবাসাকে ভালভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তাকে বেঁচে থাকতে হবে।

মাথার ওপরে রুপালি চাঁদ নিয়ে সে ছোট্ট স্টেশনটার দিকে হাঁটা দেয়। তার যে এখন বাড়ি যেতে হবে। তার যে এখন একটা ট্রেন দরকার!

মোঃ তানিম-উল-ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস
এন্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)

প্রকাশিত গ্রন্থ :
সন্ধ্যাদীপ (গল্পগ্রন্থ), সুখ সায়রে (উপন্যাস)

গল্প

মাটির ব্যাংক

আবদুল্লাহ ইবনে আলী

ঘরের ভেতরে মাথায় হাত দিয়ে চিন্তিত মুখে বসে আছে বাহার। গত চারদিন যাবৎ তার বাসায় কোনো খাবার নেই। লকডাউন এর জন্যে নেই কোনো কাজ-কর্ম। বাহারের নিজের জন্যতো কোনো চিন্তা নেই। যত চিন্তা তার ছোট্ট ফুটফুটে তিনমাসের বাচ্চাটার জন্য। ডাক্তার বলেছেন, মায়ের শালদুধ বাচ্চাটা খেতে পারবে না। তাই বাহির থেকে কেনা স্পেশাল গুঁড়োদুধকে লিকুইড বানিয়ে খাওয়াতে হয়। নিজেদের খাবারের সাথে সাথে বাচ্চাটার গুঁড়োদুধও সবটা শেষ। হাতে কোনো টাকা নেই। এই মুহূর্তে কোটি টাকা না, স্রেফ দুধের দাম অর্থাৎ, আটশো পঁচাত্তর টাকা তার কাছে নেই বলে নিজেকে পৃথিবীর সবচাইতে নিষ্কর্মা পিতা মনে হচ্ছে। বাহারের স্ত্রী বানু উঠে দাড়ালো। ভাঙ্গা খাটের নীচ থেকে একটা মাটির ব্যাংক বের করলো সে। ব্যাংকটা বাহারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বানু বলল, "এই নেন রিনার বাবা। ব্যাংকটা ভাঙ্গেন। আমরা খাই- না খাই সেইটা পরে, আগে রিনার জন্যে দুধ নিয়া আসেন। মাইয়াটা আমার একদমই ক্ষিধা সহ্য করতে পারে না।"চোখ তুলে বানুর দিকে তাকালো বাহার। দুজনের চোখই অকারণে ভিজে আসছে। সত্যিই কি অকারণে? বানুর প্রতি ভালোবাসাটা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বাহারের। অভাব অনটনের সংসারে এরকম চমৎকার সঙ্গীনীর কোনো তুলনা হয় না।

দশম শ্রেণী পড়ুয়া আবিদ। সহজ-সরল একটা ছেলে। মা-বাবার আদর্শকে লালন করবার চেষ্টা করে সে। আবিদের মা মারা গেলেন তিনবছর হলো। ব্রেইন ক্যান্সার ছিলো তার। আজ আবিদের মায়ের মৃত্যু দিবস।

প্রতিবছর এই দিনটা আবিদ বিশেষভাবে উৎযাপন করে। প্রতিবছরই আবিদ একটা মাটির ব্যাংকে টাকা জমায় এবং মায়ের মৃত্যুদিবসে সেই টাকা দিয়ে মায়ের মাগফেরাতের জন্যে এলাকার একটা বা দুটো পরিবারকে সাহায্য করে। ফজরের নামাজ পড়েই চলে গেল মায়ের কবর জেয়ারতে। গতকাল রাতে কেনা বস্তাভর্তি বাজারগুলো ভোরে চুপিচুপি রেখে এসেছে বাহার ভাইয়ের ঘরের দরজায়। আবিদ জানে বাহার ভাইয়ের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। লকডাউনে তার কোন কাজকর্মও নেই। তাই, বস্তাভর্তি খাবার দেখে বাহার ভাই নিশ্চই দোয়া করবে এবং সেই দোয়া যেন খোদা তার মায়ের কবরে পৌঁছে দেন।

সূর্য উঠতেই জানালা কড়া, তাজা রোদ ঢুকে পুরো ঘর আলোকিত করে দিল। ঘুম থেকে উঠে মুখে হায় তুলে চোখ কচলাতে কচলাতে দরজা খুলতেই দেখে, ঘরের সামনে একটা বিরাট বস্তা। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বউকে ডেকে জিজ্ঞাস করলে বউও অবাক। সেকেন্ডে মনে কত প্রশ্ন খেলে গেল। কে রাখল এই বস্তা? কী আছে এতে? কেনই বা রেখে গেল? বাইরে খানিকটা গলা টেনেও আশেপাশে কাউকে দেখা গেল না। কৌতুহল নিয়ে বস্তাটা ভেতরে ঢুকিয়ে খুলতেই চোখ আরো বড় বড় হয়ে গেল। চোখ মুখে আনন্দের ফোয়ারা বইতে লাগল। বস্তাভর্তি নানারকম খাদ্যসামগ্রী। কাল রাতে যার বাচ্চার জন্য দুধ কেনার পয়সা নাই, আজ তার ঘরে বস্তা ভর্তি খাবার। আনন্দে আত্মহারা বাহার সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় পড়ে গেলো। এবছর পাড়ার মাহফিলে শোনা মৌলভী এহসানুজ্জামান এর ওয়াজটা মনে পড়ে গেলো। তিনি বলেছিলেন, মহান আল্লাহ কোরআনের আয়াতে বর্ণনা করেছেন, "তারা কি তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহ বণ্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করি পার্থিব জীবনে এবং তাদের একজনের মর্যাদা অন্যজনের ওপর উন্নীত করেছি, যাতে তারা একে অন্যকে সেবকরূপে গ্রহণ করতে পারে (সুরা জুখরুফ, আয়াত- ৩২)।" সাথে সাথে দুহাত তুলে বাহার মোনাজাত করলো সেই মানুষটার জন্যে যিনি এই খাবারগুলো একটা অসহায় পরিবারকে দান করলেন।

বাসায় যেতে যেতে আবিদ আল্লাহ তা'লার চমৎকার একটা ম্যাসেজের কথা ভাবছে। "যারা আল্লাহর পথে নিজের ধনসম্পদ ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে, তার কথা বলে বেড়ায় না এবং (ঐ দানের বদলে কাউকে) কষ্ট দেয় না, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার আছে এবং তাদের জন্য কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না (সূরা বাকারা,আয়াত-২৬২)।"

লেখক-

আবদুল্লাহ ইবনে আলী

শিক্ষার্থী, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

ইসলামে সাধনার স্বাদ (পর্ব-১)

মুহাম্মদ মাসুম চৌধুরী

সিন্দু হতে স্পেন আজকের ২৬ টি পূর্ণ রাষ্ট্র এবং ১০ রাষ্ট্রের অংশ নিয়ে গঠিত বিশাল একটি সম্রাজ্যের নাম আব্বাসীয় খিলাফত। সম্রাজ্য যেমন বিশাল জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায়ও ছিলো সেরা। শাসকগণ ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত। ইউরোপের জন্য ছিলো তখন মধ্যযুগ (অন্ধকার যুগ)। আমেরিকার নামক রাষ্ট্রটি আবিস্কার হয় তার সাড়ে ৬ শত বছর পর।

আব্বাসীয় শাসকের তারকা শাসক খলিফা মাহদীর পক্ষে রাজ কর্মকর্তা মদিনায় ইমাম মালেক (র.)'র দরবারে গিয়ে দুই রাজপুত্র মুসা ও হারুনকে হাদিস শিক্ষার আমন্ত্রণ জানান। ইমাম এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে খলিফা মাহদী তার কারণ জানতে চান। ইমাম বললেন, "এই ইলম খুবই সম্মানিত ধন। অর্জনে সাধনা প্রয়োজন। এই ধন রাজ দরবারে যায় না, ডুবুরির মত রাজপুত্রকেও করতে হয় আহরণ।"এ কথা শুনে খলিফা দুই সন্তানকে ইমামের দরবারে সোহবত সাধনার জন্য অর্পন করেন। সাধনায় একদিন হারুন শুধু জগৎ বিখ্যাত শাসক হননি, দুনিয়ার সেরা জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষণাগার 'বাইতুল হিকমা' মালিকও হন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)'র সেরা শিষ্য, যাঁকে শুধু শিক্ষা দেননি বরং ভেতরে ভেতরে নির্মাণ করে গেছেন। যাঁর ছিলো 'ফটোগ্রাফি মেমোরি'। আম্মার ইবনে আবু মালেকের দৃষ্টিতে দুনিয়াজুড়ে হানাফি মাজহাবের জয়জয়কারে যাঁর সবচেয়ে বড় অবদান তিনিই হলেন ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)। তাঁর মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ইমাম আবু হানিফার(রহ.)'র মাজহাব। তিনি ছিলেন, বাদশাহ মাহদী - হাদী - এবং হারুনুর রশিদের প্রধান বিচারপতি (কাজিউল কোজ্জা)। আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেছেন, "আমি সর্ব প্রথম হাদিস লিখেছি ইমাম আবু ইউসুফ হতে।" তিনি আরো বলেছেন, "যে হাদিস ইয়াহইয়া ইবনে মঈনের অজানা সেটি হাদিস নয়।" সে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন ছিলেন ইমাম আবু ইউসুফের উজ্জ্বল তারকাময় ছাত্র। প্রশ্ন হল, ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) উন্নতির এই স্বর্ণ শিখরে পৌঁছলেন কী করে? কোনো যাদুমন্ত্র নয়, শুধুই ছিলো তাঁর কঠোর সাধনা। সাধনায় ডুবে থাকতেন তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)'র দরবারে। সতেরো বছর ছায়ার মত অনুসরণ করেছেন ইমামে আজমকে। দুই ঈদেও সঙ্গ ত্যাগ করেননি। একদিন ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)'র সন্তান মারা যাওয়ার সংবাদ এলো। তিনি তাঁর নিজ সন্তানের দাফন কাফনের দায়িত্ব আত্মীয় প্রতিবেশীদের নিকট ছেড়ে দিলেন। কিন্তু নিজে এক নজর দেখতেও গেলেন না। কারণ, পুত্র হারানোর বেদনা তিনি ভুলতে পারবেন, কিন্তু ঈমামের পাঠ হারানোর বেদনা কোনদিন ভুলতে পারবেন না। এই ইমাম আবু ইউসুফ ক্ষুদ্র এক দোকানির সন্তান। সাধনায় পরিণত হন জ্ঞানের মহাকাশের এক সুপারনোভায়।

হাদিস শাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থ ইমাম মালেক (র.) রচিত ‘মুয়াত্তা’। ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেছেন, “কোরআনের পর ‘মুয়াত্তা’ই সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ(তখন ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম দুনিয়াতে শুভাগমন করেননি)।” ইমাম মালেক (র.)’র ‘মুয়াত্তা’ লেখকদের ভাগ্যবান ছাত্র ইয়াহইয়া আন্দালুসি। যিনি স্পেনে মালেকী মাজহাবের প্রসার ঘটান। তিনি কী করে এত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হলেন? বিষয়টি সাধনার। তরুণ বয়সে জ্ঞান সাধনার লক্ষ্যে স্পেন হতে মদিনায় হাজির হয়ে যোগ দেন ইমাম মালেক (র.)’র পাঠশালায়। হঠাৎ, একদিন উট-ঘোড়ার দেশে এল হাতি। সবাই হাতি দেখতে ইমামের পাঠশালা হতে ছুটে গেল। কিন্তু জ্ঞান আহরণের নেশায় ইমামের দিকে চাতকের মত চেয়ে ছিলেন কেবলই একজন, তিনিই ইয়াহইয়া। ইমাম মালেক পরম মমতায় তাঁকে কাছে ডেকে বললেন, “যাও তুমিও হাতি দেখে এসো।” উত্তরে তিনি উস্তাযকে যা বলেছিলেন, তা জগতের জ্ঞান পিপাসুদের হৃদয়ে এঁকে রাখার মত কথা। তিনি বললেন, “সুদূর আন্দালুসিয়া (স্পেন) হতে আমি হাতি দেখতে আসিনি, এসেছি আপনার নিকট যে নবীজির অমূল্য সম্পদ ‘জ্ঞান’ রয়েছে তা ডুবুরির মতো আহরণ করে আজলা পূর্ণ করতে।”

দুনিয়ার সেরা নেশা জ্ঞান সাধনার নেশা। এই নেশা ডুবুরির মুক্তা খোঁজার চেয়ে আকর্ষণীয়। ডুবুরি মুক্তা খুঁজে মৌসুমে। আঁজলাপূর্ণ হলে আর ডুব দেয় না অথৈজলে। জ্ঞান অনুসন্ধানীর মৌসুম নেই, আঁজলার পরিমাণ নেই। এই স্বাদে অতৃপ্ত থাকে অন্বেষণকারী। মহানবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “দুই তৃষ্ণার্থ ব্যক্তির তৃষ্ণা কখনো নিবারণ হবে না। জ্ঞান ও সম্পদের তৃষ্ণা।”
হাদিসের পর হাদিস বর্ণনা করে জিহ্বাটা শুকিয়ে তৃষ্ণার্থ হয়ে পড়তেন ইমাম আবু দাউদ (রহ.)’র। অলিকুল সম্রাট সাহল তুসতারী (রহ.) একদিন ইমাম আবু দাউদের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, ‘আপনার নিকট একটি বিনীত আবেদন আছে। কিন্তু কথা দিতে হবে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান হবে না।” ইমাম বললেন, “কথা দিলাম, সম্ভব হলে পূর্ণ করবো।” হযরত তুসতারী বললেন, “যে জিহ্বা দিয়ে মহাকালের মহানবী (দ.)’র পবিত্র হাদিস সাধনার স্বাদ নেন, সে জিহ্বটা বের করে দিন আমি চুমু খাব।” তিনি জিহ্বাটা বের করেন, হযরত তুসতারী (রহ.) তাতে চুমু খেয়ে হাদিসের স্বাদ নিলেন। এই স্বাদ এক অমৃত স্বাদ, গ্রহণে সক্ষম কেবলই সাধকগণ।

হযরত গালেব কাত্তান (রহ.) ব্যবসা করতে কিছুদিনের জন্য কুফা যান। অবসরে কিছু হাদিস আত্মস্থ করতে যেতেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)’র শিক্ষক ইমাম আমাশের দরবারে। শিখে নেন বিপুল পরিমান হাদিস। একদিন ব্যবসার কাজ শেষ হলে বসরায় ফিরে যাওয়ার রাতটি ইমাম আমাশের খেদমতে উৎসর্গ করতে হাজির হন। ইমাম তাহাজ্জুদ নামাজের পর সুরা আলে ইমরানের ১৮ নম্বর আয়াতটি বার বার পাঠ করতে থাকেন। গালেব কাত্তান জিজ্ঞাস করলেন, “এই আয়াতটি সম্পর্কে নবীজির কোনো হাদিস আছে?” ইমাম বললেন, “আল্লাহর কসম করে বলছি, এক বছর পর্যন্ত হাদিসটি আমি বর্ণনা করবো না।” একটি হাদিস শুনতে গালেব কাত্তান (রহ.) বাড়ি ফেরা বন্ধ রাখেন। একদিন একদিন করে যেদিন এক বছর পূর্ণ হলো, সেদিন হাদিসটি জানতে চাইলেন। ইমাম বললেন, “প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি এই আয়াতটি নিয়মিত পাঠ করবেন, তিনি যখন কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট হাজির হবেন তখন তাঁকে আল্লাহ পাক জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিবেন।” অপেক্ষা কঠিন হলেও একটি হাদিসের জ্ঞান অর্জনের জন্য পূর্ণ এক বছর অপেক্ষা করে জগতের মানুষকে শিক্ষা দিয়ে গেলেন ইসলামে জ্ঞান সাধনায় রয়েছে অমৃত সুধা।

লেখক-
ড. মুহাম্মদ মাসুম চৌধুরী
লেখক, কলামিস্ট ও প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক সার্ক মানবাধিকার ফাউন্ডেশন।

জুব্বুল হুজন কী?

মোহাম্মদ আবদুল ক্বাহহার

সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি হজরত সৈয়্যদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে হাদিসটি বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করছেন, রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, তোমরা আল্লাহ তাআলার নিকট 'জুব্বুল হুজন' থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় কামনা করো। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আরজ করলেন, "ওহে রাসুলে খোদা, জুব্বুল হুজন কী?"

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন, "এটি (জুব্বুল হুজন) জাহান্নামের এমন একটি গভীর উপত্যকার নাম, যা হতে বাঁচার জন্যে খোদ জাহান্নামই প্রতিদিন চারশত বার আশ্রয় প্রার্থনা করে।"

সাহাবায়ে কেরাম পুনরায় আরজ করলেন, "ওহে আল্লাহর রাসুল, এতে (জুব্বুল হুজন) কাদের প্রবেশ করানো হবে?" হাবিবে খোদা রাসুলে দো-জাহাঁ উত্তরিলেন, "এতে প্রবেশ করানো হবে সে সকল কারীকে (কুরআনে কারিম অধ্যয়নকারীগণ), যারা নিজেদের আমল আপরের নিকট প্রকাশ করে বেড়ায়।"

ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহু তাআলা এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে মাজাহ রাহিমাহুল্লাহু তাআল-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি হাদিসের নিচের অংশটকু বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেছেন।

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাও বলেছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নিকট কুরআন অধ্যয়নকারীদের মধ্যে সর্বাধিক ঘৃণিত সে সব লোক, যারা (স্বার্থ হাসিলে উদ্দেশ্যে) শাসকদের সাথে সাক্ষাত করে। হাদিসটির পরবর্তী রাবি (বর্ণনাকারী) ইমাম মুহারেবি আলাইহির রাহমাহ বলেন, এখানে 'উমারা' (শব্দটি হাদিসের মূল ইবারত) দ্বারা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যাচারী শাসকদের বুঝিয়েছেন।

লেখক-

মুহাম্মদ আব্দুল ক্বাহহার

আলিম পরীক্ষার্থী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া

গল্প

রৌদ্দুরের বৃষ্টি (পর্ব-১)

হুরে জান্নাত তায়্যিইবা

“আসসালামু আলাইকুম,
গন্তব্যে পৌঁছানোর পর আমাকে কী একটু একা হওয়ার সুযোগ করে দিতে পারবেন? সাথে দুই পিস বিস্কিট, চকলেট বা চিপস হলে ভালো হয়। পানি লাগবে না। আমার ব্যাগে আছে। কাল থেকে রাগ করে কিছু খাওয়া হয়ে উঠেনি। প্রচুর ক্লান্ত প্লিজ?”
হাতে থাকা ছোট্ট কাগজের উপর লিখাটা পড়ে আশ্চর্য ভঙ্গিতে মেহমীম এর দিকে তাকালো আয়াত।
সাফওয়ানুল মুবতাসীম আয়াত। আজ ওর বিয়ে। গাড়িতে করে বৌ নিয়ে ফেরার সময় নতুন বউ ওর দিকে একটা কাগজ এগিয়ে দিয়েছিল। সুযোগের অভাবে দেখা হয়ে উঠেনি। গাড়ি তার আপন গতিতে ছুটে চললে কাগজটা খুলে উপরের লেখাটা দেখেই অবাক হয়ে মেহমীমের দিকে ঘুরে তাকাল। মেহমীম আর কেউ না। আয়াতের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী। পুরো নাম মুতমাঈনাতুল তায়্যিইবা মেহমীম।
আয়াত এখনো মেহমীমের দিকে তাকিয়ে আছে। অপর দিকে মেহমীম ক্লান্ত ভঙ্গিতে গাড়ির জানলা দিয়ে ব্যস্ত নগরী দেখতে ব্যস্ত।

এতক্ষণে আয়াত মেহমীমের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। কালো বোরকা, কালো হিজাব ও কালো নেকাব করা। নেকাবটা মাথার উপরে তোলা যার সুবাদে মুখটা দেখা যাচ্ছে। হাতে পায়ে কালো মোজা। হুট করে কেউ দেখলে বুঝবে না মেহমীম এই মুহূর্তে বিয়ের কনে। একটু সোজা হয়ে নড়েচড়ে বসে আয়াত আবার তাকালো মেহমীমের দিকে। চেহারাটা অন্যরকম এক প্রশান্তির আবরণে ঢাকা। স্বভাবত এরকম চেহারার মানুষগুলোকে দেখে বুঝার উপায় থাকে না তাদের ভিতরে কী চলে।
বউ এসেছে! বউ এসেছে!!
কয়েকটা বাচ্চার চিৎকার শুনে মেহমীমের ধ্যান ভাঙ্গল। একটু নড়েচড়ে পাশে তাকিয়ে আয়াতের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করে নামিয়ে নিল। সে বুঝতে পারল আয়াত এতক্ষণ তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। আয়াত অপ্রস্তুত ভাবে একবার দৃষ্টি বিনিময় করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। অপর পাশে এসে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।
মেহমীম খুব নম্র ভাবে মুখের উপর নেকাবটা টেনে দিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।
কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে এসে আয়াতকে জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করতে লাগল, “বউ কই? বউ কই?”

হয়ত বাচ্চাগুলাও অভ্যস্ত যে, বউ মানে মেকাপ এর আস্তরণে ঢাকা পড়া এক পরিচিত মুখোশের সাথে বা পুতুল সাজে সজ্জিত হতেই হবে এরকম এক প্রচলিত ধারার সাথে। যার কারণে আয়াতের পাশে মেহমীমকে দেখেও তাদের বুঝে আসলো না যে, এটাও বউ হতে পারে। আয়াত খুবই সর্তকতার সাথে মেহমীমের দিকে একবার তাকালো। সাথে বাচ্চারাও তাকালো মেহমীমের দিকে। আয়াত থেকে একটু সরে গিয়ে মেহমীমের দিকে এগোলো তারা। বাচ্চাদের এগুনো দেখে মেহমীম দু এক পা হেঁটে সামনে এসে একটু ঝুঁকে বাচ্চাদেরকে একটা সালাম দিল। তারপর মুখের নেকাবটা আবার সরিয়ে একটা মুচকি হাসি দিল।

বাচ্চা গুলা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। চোখ টিপটিপ করে একবার মেহমীম আরেকবার আয়াতের দিকে তাকাচ্ছে। এবার মেহমীম নিজে থেকেই বলে উঠলো, "আমি যদি বলি, আমিই বউ। তাহলে আপনারা কী মন খারাপ করবেন?"

সাথে সাথেই একজন বলে উঠলো, "এমা! বউ এইরকম হয় না তো!"

আরেকজন বলে উঠল, "তুমি বউ বুঝি! কিন্তু তুমি সাজোনি কেন? বউ তো হয় পুতুলের মত! মানে ডল! ডল।"

সাথে সাথে মেহমীম বলে উঠল, "আচ্ছা আমাকে দেখে বলো তো কী রকম লাগছে?"

এবার বাচ্চাগুলো মেহমীমকে পর্যাবেক্ষণ করতে লাগল। সবার কাপালেই চিন্তার রেখা। এরিমধ্যে একজন বয়স্ক মহিলা এসে বাচ্চাগুলোকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিল। এরপর মেহমীমের দিকে তাকিয়ে নাক ছিঁটকিয়ে বললো, "এএএহহ আইছে আমার হুজুর সাহেবা। বউয়ের কাপড়ের কী বাহার দেখ। কোথায় শাড়ি টাড়ি পড়ে সুন্দর কইরা বউ সাজবে তা না। আল্লাহ! আর কত কী যে দেহন লাগব!"

তারপর আয়াতের দিকে তাকিয়ে বললো, "তই আয়াত বাবা বউরে কও আমার পিছন পিছন আইতে।"

মেহমীম আয়াতের দিকে অসহায় ভঙ্গিতে একবার তাকাল আরেকবার বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে উনার পিছনে হাটা শুরু করল।

তারা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে একটা রুমে বসল। কিছুক্ষণ নিরব থেকে বয়স্ক মহিলাটা বলে উঠলো, "এটা আয়াত বাবার রুম। তুমি বসো আমি যাই। কাউরে পাঠাই।" বলেই মহিলা চলে গেলেন। তাদের পিছন পিছন আয়াত ও এসেছিল। সেও "আসছি" বলে বেরিয়ে গেল।

একটু পর পরই কয়েকজন মেয়ে ও কয়েকটা বাচ্চা রুমে ঢুকলো। গাড়ি থেকে নেমে প্রথম যাদের দেখেছিল এগুলো সেই বাচ্চা।

মেহমীম মুচকি হাসি বিনিময় করল তাদের সাথে। "আচ্ছা, আপনাকে বিয়ের সাজে সাজানো হয়নি কেন? নাকি আপনাদের পরিবারে কঠোর ভাবে ইসলাম পালন করে তাই?" এক মেয়ে প্রশ্ন করেই ফেলল। খুব গোছানো প্রশ্ন। মনে হল যেন এটা তারা অনেক্ষণ ধরে ভাবছে।

একজন প্রশ্ন করতেই অন্যরাও স্বর মিলাল, "আমাদেরও একই প্রশ্ন।"

মেহমীম তাদের দিকে মুচকি হেসে তাকিয়ে সবাইকে একবার দেখল। সবাই আধুনিক সাজে সজ্জিত। যাকে বলে বিয়ের গর্জিয়াস সাজ।

মেহমীম মুচকি হেসে বললো, "আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সম্পর্কে আমার কী হবেন বুঝতে পারছি না। যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলি?"

মেয়েগুলো চোখ ছোট করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, "বলেন, কী বলবেন।"

মেহমীম চোখ বন্ধ করে একটা দীর্ঘশ্বাস নিল। এরপর বলল, "প্রথমত ইসলাম মোটেও কঠোর নয় বরং, সবচেয়ে সহজ জীবন বিধান ইসলাম। তবে, আমরা কিনা বোকা জাতি তাই নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে ইসলাম কে জটিল করে ফেলি। দ্বিতীয়ত, কোন গ্রন্থে বা সংবিধানে নির্দিষ্ট করে কী লিখা আছে বিয়ের সাজ ঠিক কী রকম?"

মহিলারা হুট করে নিজেদের প্রশ্নের প্রতিত্তোরে এরকম একটা প্রশ্ন পেয়ে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। একজন মিনমিন গলায় বলল, "নাহ। তা মনে হয় নেই। আসলে.."

মেহমীম বাঁধা দিয়ে মাঝখানে বলে উঠল, "যদি এরকম কোন নিয়ম না থাকে তাহলে আমার বিয়ের সাজ-সজ্জা নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন বা আপত্তি জাগার ঠিক কারণটা কী বলতে পারবেন?"

একটু থেমে বিসমিল্লাহ বলে মেহমীম পুরো একটা তেলাওয়াত করে ফেলল সবার সামনে। সবাই মুখ হা করে অপলক চেয়ে রইল মেহমীমের দিকে। এরা হয়তো ভাবতেও পারছেনা এটা কী হয়ে গেল! হুট করে এভাবে এত্ত মধুর কণ্ঠে সদ্য বিবাহিত কনে কোরআন তেলাওয়াত করবে এবং অর্থ বিশ্লেষণ করবে তাদের কল্পনাতীত ছিল। আয়াতটি হল, "ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও(সূরা আন নূর ৩১)।"

বাচ্চা গুলোর চোখ কপালে। ইতিমধ্যে রুমের দরজায় আরো মানুষের ভীড় লক্ষ্য করল মেহমীম। কিছুক্ষণ পর একজন বলে উঠল, "বুঝেছি, আপনাকে যতটা সরল ভেবেছিলাম ততটা আপনি হবেন না।" প্রতিত্তোরে এবারও মেহমীম মুচকি হাসি দিল। হাসিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। পরক্ষণে কোন একজনকে স্মরণ হতেই হাসির ছাপটাও ম্লান হয়ে গেল। এমন একজন যে মেহমীমের জীবনে রৌদ্দুরের বৃষ্টির মতই হুট করে এসেছিল।

রাত দুইটা ছুঁই ছুঁই। এখন বিয়ে বাড়ি অনেকটাই শান্ত। হয়তো বউ দেখেই তাদের সকল আনন্দ ম্লান হয়ে গিয়েছে বলেই এমন নীরবতা। রুমে আসার সময় যতটুকু খেয়াল করতে পেরেছে তাতে বুঝা গেল বাড়িটা ডুপ্লেক্স। চিমচাম ফার্নিচার আছে। দেয়ালে রাজকীয় ধাঁচের কারুকার্য দেখে বুঝা যাচ্ছে রাজকীয় একটা ছোঁয়া আনার প্রাণপণ চেষ্টা চালানো হয়েছে। হল ঘরের একপাশে একটা এ্যাকুরিয়াম রাখা আছে যেটা স্বাভাবিকের চাইতেও বড়। বড় হলেও তাতে মাত্র কয়েকটাই গোল্ড ফিশ আছে। গোল্ড ফিশরা নাকি যে কোন বিষয় মাত্র পনের সেকেন্ড মনে রাখতে পারে।
বিয়ে বাড়ি হিসেবে যত লোকের সমাগম থাকা দরকার অতবেশি লোকজন চোখে পড়েনি।
হঠাৎ, মেহমীমের পায়ের উপর একটা তেলাপোকা এসে পড়লো। পায়ের উপর কিছুক্ষণ অবস্থান করে নেমে গেলে নিজ দায়িত্বে। তেলাপোকার দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে কখন যে চোখ দু'টো ঝাপসা হয়ে আসল বুঝা গেল না। মানুষের চোখ দু'টো বড্ড বেইমান। কারণে অকারণে ঝাপসা হয়। আমরা সব মিথ্যা মেনে নিতে পারলেও চোখ যখন মিথ্যা বলে তখন তা মানিয়ে নিতে পারিনা, আর মানিয়ে নিলেও আড়াল করতে পারি না। জোড়া হাত দিয়ে চোখ মুছে পুরো রুমের দিকে তাকাল।

রুমের ইনটেরিয়োর ডিজাইন দেখে বুঝা যাচ্ছে না আপাতত রুমটা কে সিম্পল বলবে নাকি গর্জিয়াস। একপাশে অতি যত্নে সাজানো মাঝারি সাইজের একটা বুকশেলফ। পাশে টেবিল, তার উপর ল্যাপটপ। তারপাশে এক আলমারি। অদ্ভুতভাবে রুমের সব ফার্নিচারই কালো। দেয়ালের রং ধবধবে সাদা। মেহমীম সিলিং এর দিকে তাকালো। ওর জানা মতে সিলিং সাদা হয় কিন্তু এখানে অদ্ভুত কাণ্ড! সিলিং এর রংটা কী বলে ধরে নিবে বুঝতেছে না। শুধু সিলিং এ ফোকাস করলে মনে হচ্ছে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। সাদার সাথে আসমানির সমন্বয়ে একটা মায়াজাল হয়ে আছে।
আনমনে কিছুক্ষণ তাকানোর পর মনে পড়লো রুমের বাকী দিক এখনো দেখা বাকী। কিন্তু ওর প্রচুর ক্ষিধে পেয়েছে।
আয়াতকে যে চিরকুট দিয়েছিল সেটা আয়াত পড়ার সুযোগ পেয়েছিল কী না নিশ্চিত না, তাই ওর উপর রাগ করা উচিৎ মনে হচ্ছে না। তবে একটা ব্যাপারে রাগ উঠছে, সেই বৃদ্ধা রুমে দিয়ে যাওয়ার পরপরই এখন আসছি বলে বেরিয়েছে আসার আর নাম নেই। হঠাৎ ওর মনে হল আয়াত আসছি বলে যে দরজা দিয়ে বেরিয়েছিল সেটা আর ওরা যে দরজা দিয়ে রুমে ঢুকেছিল ওটা এক না। তার মানে রুমে দরজা দুটা। একটু চোখ বোলাল। হুম, আসলেই পাশাপাশি দুটা দরজা। আরেকটা কীসের হতে পারে? ধারণা করার চেষ্টা করতে লাগলো।

সময় দুইটা ত্রিশ। আয়াতের আসার এখনো নাম নেই। মেহমীম দ্বন্দ্বে পড়ে গেল গিয়ে দেখবে কী না! নাহ দেখা উচিৎ। তবুও ধীর পায়ে এগিয়ে গেল। টান দিতেই খুলে গেল দরজা। দরজার অপর পাশ দেখার পর আশ্চর্যের চরম পর্যায়ে! পুরো রুমের চারপাশটাই বেলকণি। শুধু বেলকণি বললে ভুল হবে যেন ক্ষণিকের স্বর্গ। আবছা আলোয় দেখে যতটুকু আঁচ করা যাচ্ছে পরম যত্নে সাজানো সব গাছ সাথে মাতাল করা মন ভুলানো এক অপরিচিত সৌরভে আচ্ছাদিত চারপাশ।

নাহ এখন ওর স্বর্গ উপভোগ করলে হবে না। তাই হাঁটা শুরু করলো। হাটার পরিমাণে মনে হচ্ছে একরাউন্ড দিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যে। অবশেষে দেখতে পেল আয়াত কে।

রুম থেকে আসা লাইটের আলোতে মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অথচ এতক্ষণ রুম নিয়ে গবেষণা করে একবারও মনে হয়নি জানলা আছে।

আয়াতের চেহারা দেখে বুঝা যাচ্ছে অনেক্ষণ ধরে কান্না করতে করতে চোখের জল ফুরিয়ে গেছে।

চোখ বন্ধ করে বাম হাত চুলে ব্রাশ করে পিছনে নিয়ে গিয়ে চুল টেনে ধরেছে মুটো করে। হয়ত কান্নার ফলে মাথা ব্যথা উঠছে। অসম্ভব কিছু না। ঠোঁট দাত দিয়ে কামড়ে ধরা।

যদি বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য গুলোর একটা বলো তাহলে চোখ বন্ধ করে এটা বলব।

মানে কোন ছেলে যখন প্রচণ্ড রাগে কিংবা অধিক কষ্ট চাপা দিতে হাত দিয়ে মাথার চুল টেনে দাতে ঠোঁট কামড়ে ধরে তখন দৃশ্যটা আসলেই সুন্দর। যাকে বলে ফ্রেমে বন্দী করে রাখার মতই, নান্দনিক।

মেহমীম চাইলেই কয়েকটা ছবি উঠিয়ে নিতে পারত কিন্তু নিচ্ছে না। কী দরকার! সব নান্দনিক দৃশ্যকেই বুঝি আধুনিকতার ছোঁয়া দিতে হয়? কিছু কিছু বিষয়কে স্মৃতিতেই উপভোগ করার জন্য রেখে দেয়া দরকার। এই মুহূর্তে মোটেও আয়াতের মনোযোগ নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না তাই রুমে ফিরে এলো । রুমে এসে চেয়ার টেনে বসে পড়লো এবং স্মৃতি তে ডুব দিল।

গ্রন্থকথা

চরিত্রনির্মাণে আবু ইসহাকের আসল মুনশিয়ানা

সূর্য-দীঘল বাড়ী

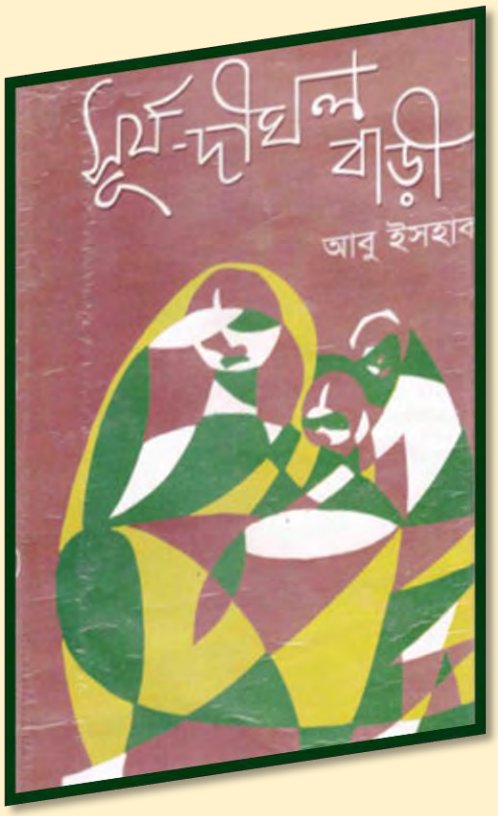

সূর্য-দীঘল বাড়ী (গ্রামীণ উপন্যাস)

আবু ইসহাক

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৫

যেভাবে নজরুলের ব্যাপারে বলা হয় ‘কেবল অগ্নিবীণা লিখলেই তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হতেন’; যেভাবে বিভূতিভূষণের ব্যাপারে বলা হয় ‘কেবল পথের পাঁচালী লিখলেই তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হতেন’; যেভাবে আল-মাহমুদের ব্যাপারে বলা হয় ‘কেবল সোনালী কাবিন লিখলেই তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হতেন’ ঠিক সেভাবে কথাশিল্পী আবু ইসহাকের ব্যাপারে নির্দ্বিধায় বলা যায় ‘কেবল সূর্য-দীঘল বাড়ী লিখলেই তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হতেন’।

চরিত্রনির্মাণে আবু ইসহাক যে মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন তা অন্তত বাংলাদেশী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিরল প্রকৃতির। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জয়গুন- জয়গুনকে এমন সংগ্রামী প্লটে তিনি ফেলেছেন, এমন মরণদশার মানচিত্রে তিনি জয়গুনের চিত্র স্থাপন করেছেন যে, তাকে দিয়ে যা যা করাতে, বলাতে চেয়েছেন ঠিক তা তা খুব স্বাচ্ছন্দ্যে পেরেছেন। এক পর্যায়ে আবু ইসহাক জয়গুনের ব্যাপারে বলেছেন: “ধর্মের অনুশাসন সে ভুলে যায় এক মুহূর্তে। জীবন-ধারণের কাছে ধর্মের বারণ তুচ্ছ হয়ে যায়, মিথ্যে হয়ে যায় তার কাছে।”

আরেক জায়গায়: "ক্ষুধার অন্ন যার নেই, তার আবার কিসের পর্দা, কিসের কি? সে বুঝেছে, জীবন রক্ষা করাই ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র। জীবন রক্ষা করতে ধর্মের যে কোন অপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সে প্রস্তুত। উদরের আগুন নিবাতে দোজখের আগুনে ঝাঁপ দিতেও তার ভয় নেই।" ধর্মের প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধে এই যে আক্রমণাত্মক উচ্চারণ, ধর্মের 'অপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে' জয়গুনকে প্রস্তুত করে দেওয়া এসব নিয়ে আবু ইসহাক কোনোরকম দ্বিধায় পড়েন না, কলম একটুও কাঁপে না! কিন্তু কেন? কারণ, জয়গুনের চরিত্রকে তিনি এতোটা বাস্তবানুগ, সংগ্রামমুখর এবং বেহাল দশার ক্যানভাসে এঁকেছেন যে, যত ধর্মান্ধ পাঠকই হোক না কেন, জয়গুনের এসব উচ্চারণে পাঠক এতটুকুও বিচলিত হবে না, বরং পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে জয়গুনের প্রতি তার সহানুভূতি ঢের উপচে পড়বে। এখানেই চরিত্রনির্মাণে আবু ইসহাকের আসল মুনশিয়ানা ফুটে উঠেছে।

আবু ইসহাক তার মনের অব্যক্ত কথা বিনাবাধায় বলতে জয়গুনের শরণাপন্ন হয়েছেন এবং সার্থকতার সাথে বলাতে পেরেছেনও। এই পারার জন্য তার 'জয়গুন' চরিত্র এবং পরিবেশকে এমনভাবে সৃষ্টি করতে হয়েছে যে, যেখানে পাঠক নির্মাতার নিকট কোনো কৈফিয়ত চাইবে না, বরং পাঠকের মনোভাব থাকবে 'এটাই তো বলার ছিল, এমনটাই তো হওয়ার ছিল'। অর্থাৎ, বিকল্প কোনো রাস্তা আবু ইসহাক রাখেননি। এই পয়েন্টে একজন চিত্রনির্মাতা হিশেবে আবু ইসহাকের অসাধারণত্বের জুড়ি মেলা ভার। এক্ষেত্রে তিনি বর্তমান ঔপন্যাসিকদের নিকট যথা-অর্থে অনুসরণীয়। ধর্মান্ধতা, প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য কেমন চরিত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয় তা শেখার জন্য বাঙালী ঔপন্যাসিকের নিকট আবু ইসহাক একজন চিরায়ত ওস্তাদ।

আমরা আবু ইসহাকের অন্য উপন্যাস জাল এর ভূমিকা থেকে জানতে পারি, সূর্য-দীঘল বাড়ী লেখা শেষ হয়েছিল ১৯৪৮ সালে, কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয় ১৯৫৫ সালে- কেন? কারণ, মাঝখানে ৭ বছর তিনি এই উপন্যাসের কোনো প্রকাশক খুঁজে পাননি। অন্তত বাংলাদেশের জন্য কি এটা বিরল কোনো ঘটনা? মনে হয় না।

SMS iT
A Revolation in iT Solution
Phone: 01906759012
Email: smsitworld@gmail.com
www.smsitworld.com

হাঙর নদী গ্রেনেড

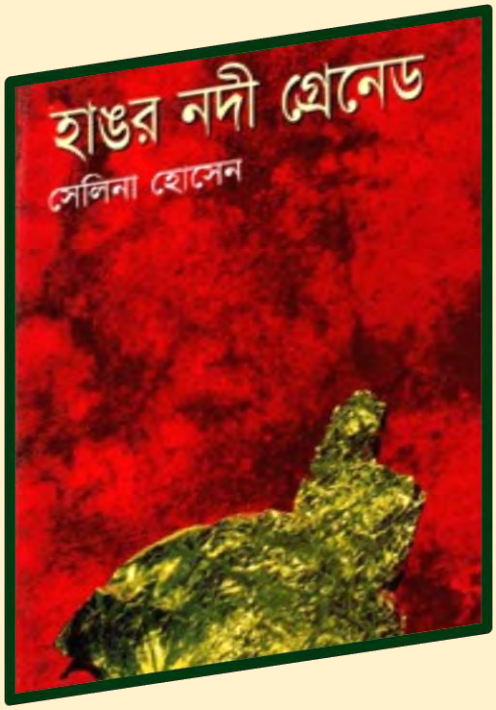

সেলিনা হোসেন

প্রকাশক: মুনিরুল হক

অনন্যা প্রকাশনী, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রিত মূল্য: ১৫০.০০ টাকা

সত্তরোত্তর অধুনা বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস লেখা হয়েছে বেশ ক'টি। স্বনামধন্য বাঙালি লেখিকা সেলিনা হোসেন-এর 'হাঙর নদী গ্রেনেড' তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের কাতারে একেবারে শীর্ষে। এ উপন্যাসটির আলোকে নির্মিত হয়েছে বিখ্যাত বাংলা সিনেমাও।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত উপন্যাসটিতে নায়িকা হল এক বুড়ি। জীবন পরিক্রমার শেষপ্রান্তে এসে সাক্ষী হয়েছে দেশমাতার মুক্তিসংগ্রামের। মুক্তিযোদ্ধের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গেছে, তা বর্তমান যুগের জন্যও নিঃসন্দেহে প্রেরণার বাতিঘর।

বুড়ি নামে সম্বোধিত হতে সে মোটেই পছন্দ করত না। সে ছিলো চঞ্চল ও উদাস। সবসময় আকুল হয়ে থাকত নিজ গ্রামের বাইরের পৃথিবীটায় বিচরণের। গফুরকে বিয়ে করতে সম্মতি দেওয়ার পেছনে এটিই ছিল আসল কারণ। কিন্তু বুড়ির ইচ্ছে অপূর্ণই রয়ে গেল। বাপের বাড়ির ঠিক দক্ষিণ দিকটাতেই তার শ্বশুরালয়। তবুও যখন গফুর তাকে নৌকায় করে ঘুরতে নিয়ে যেত, তার আনন্দের যেন সীমা থাকত না। বুড়ির স্বামী গফুর বয়সে তার থেকে বেশ বড়ো হলেও বুড়িকে সব সময় খুশি রাখতে সচেষ্ট থাকত।

গফুরের সাথে বেশ আনন্দেই কাটতে থাকে বুড়ির দাম্পত্য জীবন। কিন্তু তার আর এসবে মন ভরে না। সে চায় মা হতে। বিয়ের পর অনেক বছর কেটে গেলেও বুড়ি তখনও সন্তানের মুখ দেখেনি। তার ছোটোবেলার সই তাকে এক বাবার নামে মানত করতে পরামর্শ দেয়। অনেক কাল পরে এক সময় তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। মাতৃত্বের সুধা তাকে ধরা দেয়। ছেলের নাম রাখে 'রইস' কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস, তার সন্তান রইস হলো হাবা-বোবা।

গ্রন্থকথা

গফুরের সাথে বিয়ে হওয়ার আগে বুড়ির আরও একবার বিয়ে হয়েছিল। সে ঘরে অবশ্য বুড়ির দুই ছেলে আছে- সলিম আর কলিম। ছোটো থেকে তারা বুড়ির কোলেই মানুষ। এখন তারা বড়ো হয়েছে। সলিমের তো বিয়েও হয়ে গেছে। আবার সলিমের ঘরেই এসেছে এক পুত্র সন্তান। বুড়ির সংসার এখন নাতির আগমনে যেন চাঁদের হাট।

দিন কয়েক হলো সলিমকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। বুড়ি লক্ষ করল তার সেই চিরচেনা গাঁ আর আগের মতো নেই। সবাই কেমন যেন সাহসী হয়ে ওঠেছে। একসময় সলিম বুড়ির কাছ থেকে বিদায় নিতে আসে। সলিম মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। ইতোমধ্যে গ্রামে মিলিটারি হানা দিয়েছে। গাঁয়ের গণমানুষের ওপর তাদের অত্যাচার তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠেছে। বুড়ি চাইত সলিম-কলিমের মতো সে নিজে এবং রইসও যেন তাদের গাঁয়ের জন্য কিছু করতে পারে।

বুড়ির গ্রামে এখন মুক্তিযোদ্ধা আছে কয়েকজন। কলিম অবশ্য যুদ্ধে গিয়ে শহিদ হয়েছে। গাঁয়ের হাফিজ ও কাদের মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আগে বুড়ির কাছে এসেছিল বিদায় নিতে। কেমন করে যেন মিলিটারি খোঁজ পেয়েছিল যে, হাজিফ ও কাদের বুড়ির ঘরে আছে। মিলিটারি যখন বুড়ির ঘরে আসে, তখন বুড়ি হাফিজ ও কাদেরকে ঘরে লুকিয়ে রেখে আপন ছেলে রইসকে ঠেলে দেয় মিলিটারির দিকে। তখনই মিলিটারিরা ধাতব বুলেটে ঝাঝরা করে দেয় রইসের বুক। মিলিটারি চলে গেলে বুড়ি হাফিজ আর কাদেরকে পরামর্শ দেয় মিলিটারির চোখ এড়িয়ে পালিয়ে যেতে। বুড়ির ত্যাগ আর সহযোগিতায় সেদিন হাফিজ আর কাদের মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে পেরেছিল। দেশমাতার স্বাধীনতার জন্যে এক মা আপন সন্তানকে বিসর্জন দিতেও পিছ পা হননি। এমনি এক মা ‘বুড়ি’।

বুড়িটির মতো এমন হাজারো মায়ের আত্মত্যাগে আজ আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন দেশ। এমন বীরাঙ্গনা মায়েরা আমাদের অহংকার, আমাদের অনুপ্রেরণা।

লেখক-
সাদিয়া তাবাচ্ছুম
আলিম প্রথম বর্ষ,
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্রাসা।

মহাযজ্ঞে ধ্রুবক

জুবায়ের ইবনে কামাল

ঈশ্বর কি আদৌ আছেন? ঈশ্বর কি সত্যিই আছেন? যার কোন ভিডিও নেই তাকে আমি কীভাবে বিশ্বাস করি? আর তাই এখন আমি নাস্তিক।

এটুকু লিখে একটা ম্যাসেজ কয়েকদিন আগে আমার ফেসবুক ইনবক্সে পাঠায় ক্লাস নাইনে পড়ুয়া নিতান্তই বাচ্চা এক ছেলে আমিও! বয়সে বাচ্চা বটে। কিন্তু তার এই প্রশ্ন শুনে ঈশ্বর কি আসলেই আছে কিনা তা নিয়ে আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসে। আইডিয়াটা একটু ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু তার আগে একটা ভূমিকা দেয়া দরকার।

আমরা আমাদের পরিচিত পৃথিবীটাকে যতটা গোছালো দেখি সেটা কিন্তু এতটা গোছালো ছিলো না। প্রত্যেকটি পরতে পরতে অদ্ভুত এক শক্তি সবকিছুকে সঠিকভাবে পরিচালনা করছে। কিন্তু বলাটা যতটা সোজা ব্যাখ্যা করা ততটাই কঠিন। বাঙালীর স্বভাব হলো কোন কিছু একটু জটিল হলেই এড়িয়ে যাওয়া। আর তাতে যেটা ঘটে তা হলো, সঠিক জ্ঞানের চর্চা হয় না। ধরুন, দাবী করা হয় কোরআন এমন একটি বই যেটিতে কোন বৈজ্ঞানিক ভুল নেই। এটা নিয়ে কথা বলাটা জটিল। কারণ হাজারখানেক আগে লেখা একটি বইয়ে কোন ভুল নেই এটা দাবী করতে হলে আপনার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয়ে জ্ঞান থাকা জরুরী। কিন্তু আমরা মুখে বলতে খুবই পছন্দ করি, এখানে কোন ভুল নেই। কিন্তু যদি সত্যি সত্যি কোন অসামঞ্জস্যতা নিয়ে আসে তবে কি আপনি সমাধান করতে পারবেন? বেশীরভাগ বাঙালী মুসলমানই পারবে না। কারণ তার জ্ঞান মুখে বলা পর্যন্তই। এই নির্ভুলের তাৎপর্যতা নিয়ে জটিল চিন্তা সে কখনই করেনি।

এখানকার ব্যাপারটাও এরকমই। কোটি কোটি বছর ধরে বলা হচ্ছে একজন অতি-ক্ষমতাধর আছেন যিনি পুরো বিশ্ব চালাচ্ছেন। কিন্তু, সত্যিই এই দুনিয়াটা চালাতে অতি-ক্ষমতাধর কারো প্রয়োজন আছে কি? আমরা তলিয়ে ভাবিনি। এই তো সকালে উঠছি, ব্রাশ করছি। কাজে যাচ্ছি, আয় করছি, খাচ্ছি এবং বেড়ে উঠছি। মাঝখানে এই ক্ষুদ্র জীবনকে সহজ করতে আমরা মানুষেরা মিলেই বের করছি অবিশ্বাস্য সব প্রযুক্তি। বিজ্ঞানশাস্ত্র আমাদের সাহায্য করছে। যেটি আবিস্কার করেছি আমরাই। এখানে অতি-ক্ষমতাধর কারো কি থাকার প্রয়োজন আদৌ আছে? নাকি এই ধারণাটা আসলে ভুয়া?

তবে এখন এই জগতের কোটি কোটি জটিল বিষয় থেকে মাত্র একটা বিষয় নিয়ে বাৎচিত করা যাক। তবে আগেই বলে রাখি, এখন যা লিখছি তা বুঝতে হলে আপনাকে অন্তত এসএসসি লেভেল পর্যন্ত যেতে হবে। আমরা যারা নাইন-টেনে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হয়েছিলাম তারা একটা শব্দের সাথে বেশ পরিচিত। তা হলো 'ধ্রুবক'। ধ্রুবক কী বা কেন? এসব না জানলেও সবাই আমার মত একটা জিনিস ঠিকই জানে যে ধ্রুবকের একটি নির্দিষ্ট মান রয়েছে। যা অপরিবর্তনীয়। এ যেমন আমার ভাই 'তানভীর ধ্রুব', তো তার বায়োতে লিখে রেখেছে, মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মান পরিবর্তন হবে কিন্তু তানভীর ধ্রুবের মান পরিবর্তন হবে না। তবুও যারা জানেন না তাদের বলি, ধ্রুবক হলো এমন একটি বাস্তব সংখ্যার উপস্থিতি যার মান সবসময় অপরিবর্তনীয় (উইকিপিডিয়া থেকে টুকে দিলাম)। আরো সহজভাবে বলতে গেলে, গণিতের একটি বিশেষ নিয়ম হচ্ছে ধ্রুবক। যেটির মান কখনই পরিবর্তন হয় না। যেমন: পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তুকে পৃথিবীর কেন্দ্রে থাকা অভিকর্ষ তার নিজের দিকে টানছে। মানে আপনি যখন একটা বস্তু হাত থেকে ফেলেন তখন সেটা নিচে পরে যায় কেন? কারণ অভিকর্ষ। মানে পৃথিবীর কেন্দ্রে থাকা অভিকর্ষ বল সেটিকে টানছে। মজার ব্যাপার হলো, অভিকর্ষ বল কিন্তু পৃথিবীর সকল বস্তুকে সমানভাবে টানছে। রাস্তা দিয়ে রিক্সা যাচ্ছে সেটিকে যেমন টানছে, আপনি যেমন হেটে যাচ্ছেন আপনাকেও একই মাপের শক্তি দিয়ে টানছে। আর এই টানের কারণেই রিক্সাকে সামনে নিতে রিক্সাওয়ালার বল প্রয়োগ করতে হয়। শক্তির বিপরীতে কাজ করতে হলে তো শক্তি দিতেই হবে।

ধ্রুবকের সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হলো- মহাকর্ষীয় ধ্রুবক। আমি জানি, এই নামটি শোনার সাথে সাথেই সদ্য বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হওয়া পোলাপানের মাথায় এর মান ঝলক মেরে গেছে। মহাকর্ষীয় ধ্রুবক হলো মহাকর্ষীয় শক্তির গানিতিক প্রকাশ, যেই শক্তি দিয়ে পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তু একে অপরের দিকে টানছে। মহাকর্ষীয় ধ্রুবককে সাধারণত ইংরেজি অক্ষরের বড় হাতে 'G' দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এর মান হলো সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইনভার্স এলাভেন। আরো সহজভাবে বলি, ১ এর পিঠে ১১ টি শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তা হলো 'এক লক্ষ কোটি'। এই সংখ্যা ৬ দিয়ে (এক লক্ষ কোটি).৬৭ সংখ্যাটিকে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় সেটাই হলো মহাকর্ষীয় ধ্রুবক। ভাবতে পারছেন এই ধ্রুবকের মান কত ক্ষুদ্র! আরে আমাদের আদর্শ সড়ক মোড়ের নশুর মুদি দোকানের ক্যালকুলেটরে এই হিসেব চাপতে গিয়ে ক্যালকুলেটরটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

নিউটনের একটা বিখ্যাত সূত্র হলো 'মহাকর্ষ' সূত্র। আমি কদিন আগে মুখস্থ করেছি। মহাবিশ্বের যে কোন স্থানে থাকা দুইটি (ভারবিশিষ্ট) বস্তু একে অপরকে বল দিয়ে আকর্ষণ করে। একেই বলে মহাকর্ষ বল। এই বল কতটুকু তা বের করা খুবই সোজা। নিউটনের সূত্রানুযায়ী, 'মহাকর্ষীয় বল দু'টি বস্তুর ভরের গুনফলের সমানুপাতিক ও তাদের মধ্যকার দূরত্বের বর্গের বস্ত্যানুপাতিক'। গাণিতিক সমীকরণে লিখতে হয়, এফ ইক্যুয়েলটু জি (G) ইনটু এম (m) ডিভাইডেট বাই আর (r) স্কয়ার। এখানে G-টা হলো সেই মহাকর্ষীয় ধ্রুবক যার মান আমরা আগেই বলেছি। এবার একটু ভাবুন, আমরা মানুষেরাও একপ্রকার বস্তু। কিন্তু কই আমরা তো একে অপরের প্রতি আকর্ষণ বল অনুভব করি না! কই আমার অদূরে সিল্কি চুলের দুই বিনুনিওয়ালা মেয়েটা দাঁড়িয়ে থাকলেও তো এই মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে সে আমার কাছে চলে আসে না! কেন আসে না? আসলে মহাকর্ষীয় বল এক্ষেত্রে খুবই দুর্বল। তাই আমরা বলটা অনুভব করতে পারি না। আগেই তো বলেছি, এর বলের মান এতই ক্ষুদ্র যে তা বের করতে গিয়ে নশু আঙ্কেলের ক্যালকুলেটর নষ্ট করে ফেলেছি।

আচ্ছা যদি এর মান আরেকটু বেশি হতো? অর্থাৎ এতই কম প্রভাব যে বিনুনি করা মেয়েটা কাছে আসা দূরে থাক টেরই পাই না। তাহলে বেশি হলে কিইবা ক্ষতি হতো! আচ্ছা, এই বিষয়ে বলার আগে আমরা বরং বেশি মানের একটা বলের ধ্রুবক নিয়ে আলাপ করি।

যে কোন দু'টি বস্তুর মধ্যকার আকর্ষণ বল যেমন নিউটনের সূত্র দিয়ে বের করা যায় ঠিক তেমনি দুইটি চার্জের মধ্যকার আকর্ষণ বল বের করা যায় কুলম্বের সূত্র দিয়ে। কুলম্ব মশাই নিউটনের সূত্র মুখস্থ করে চার্জের উপর খাটিয়ে দেখলেন, বাহ ঠিকই খাটে। নিউটনের মহাকর্ষীয় বলের সূত্রের m এর জায়গায় q বসালেই হয়ে যায়। মানে m হলো বস্তুর ভর আর q হলো চার্জের ভর। কিন্তু এই সূত্রটা প্রকাশ করার আগে তার আরেকটি ধ্রুবকের মান বের করতে হলো। কুলম্বের সূত্রে তাকে K দিয়ে প্রকাশ করা হয়। K এর মান এত বড় যে, এটির সঠিক মান বের করতে হলে 8.988 এর সাথে প্রায় দশ কোটি দিয়ে গুন করতে হবে!

মহাকর্ষীয় ধ্রুবক G এর তুলনায় এটা কয়েক কোটি গুন বৃহত্তর। আচ্ছা এবার ভাবুন এই মানটা বা এই প্রভাবটা যদি চার্জের বদলে মহাকর্ষীয় বলে থাকতো, তবে কী হতো? ধরুন, আপনি গরম চায়ে আলতো করে চুমুক দিলেন। চায়ের কাপ আপনার ঠোটে এইট পয়েন্ট নাইন ইনটু টেন টু দি পাওয়ার নাইন গতিতে আকর্ষণ করতো। পৃথিবীর কিছুই একে আলাদা করতে পারতো না। ধরেন এটা আলাদা করতে আসলো একটা ক্রেন। সেই ক্রেনও তো ভরবিশিষ্ট একটি বস্তু। মহাকর্ষীয় বলের আকর্ষনও তো তার মধ্যে বিদ্যমান। যেই আকর্ষণে গরম চা কাপ সমেত আপনার ঠোটে আটকে আছে সেই একই পরিমান বল নিয়ে ক্রেনও আপনাকে আকর্ষণ করতো। একে একে পৃথিবীর সব কিছু কাজে লাগালেও লাভের লাভ কিছুই হতো না। অথবা ধরুন, বাথরুমে কমোড থেকে উঠতে গেলেন। কমোড আপনার শরীরের সাথে উঠে চলে আসতো। আপনার শরীর আলাদা করে ফেললেও সেটা আলাদা হতো না।

নিউটন এই বিষয়টি সবার আগে প্রত্যক্ষ করেন। এজন্য উনি এই প্রাকৃতিক বিষয়টিকে ধ্রুবকের মধ্যে সাব্যস্ত করেন। কারণ উনি জানতেন শুধু ঢাকার মিরপুরের রাস্তা কেন পুরো পৃথিবীর নিয়ম পরিবর্তন হলেও প্রকৃতির নিয়ম পরিবর্তন হবে না।

তবে উপরের কথাগুলো থেকে ভালো করে চিন্তা করলে বোঝা যায় ধ্রুবকের মান এত ক্ষুদ্র বা চার্জের ক্ষেত্রে এত আকর্ষণ বল বেশি হবার কারণ কিন্তু একটাই। প্রকৃতিতে যেন কোন বিশৃঙ্খলা না ঘটে। কোন বস্তুর যেন তার নিজ-কর্মে ব্যাঘাত না ঘটে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, কয়েক হাজার কোটি বছর আগে এই মহাবিশ্বের যখন কিছুই ছিলো না ঠিক তখন প্রকৃতির অনিয়ম রুখতে, পৃথিবীর সব বস্তুর কাজের গতি ঠিক রাখতে এত সুক্ষ্মভাবে ধ্রুবকের মান কে নির্ধারণ করেছিলেন?

কেইবা জানতো এই মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র একটি গ্রহে প্রাণের সঞ্চার হবে? যেখানে প্রকৃতির সকল নিয়ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সামান্য ধ্রুবকের মান নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা কে বোধ করেছিলেন? এত বড় মহাযজ্ঞের পরিকল্পনাটা কার ছিলো?

ক্যালিগ্রাফি

আয়াতুল কুরসি

পবিত্র আল কোরআনকে মহান আল্লাহ মানব জাতির হিদায়াত ও জীবন বিধান হিসেবে নাজিল করেছেন। এই মহামূল্যবান গ্রন্থের দ্বিতীয় সুরা আল বাকারার ২৫৫তম আয়াত হলো আয়াতুল কুরসী। এ আয়াতটিতে ১০টি বাক্য রয়েছে। যার প্রত্যেকটিতে আল্লাহর ক্ষমতার বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদিসের কিতাবগুলোতে এই আয়াতের ফজিলত সম্পর্কে অনেক অনেক বর্ণনা এসেছে। যেমন-
উবাই বিন কাব থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহর কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। আয়াতুল কুরসীর একটি জিহবা ও দুটি ঠোট রয়েছে এটি আরশের পায়ার কাছে আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকবে (মুসনাদে আহমদ: ২১৬০২)।"
আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহর রাসুল সাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি প্রতি ফরজ নামায শেষে আয়াতুল কুরসী পড়ে, তার জান্নাতে প্রবেশ করতে মৃত্যু ছাড়া কোন কিছু বাধা হবে না(সহীহ আল্ জামে :৬৪৬৪)।"

ক্যালিগ্রাফি

হজরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসি নিয়মিত পড়ে, তার জান্নাতে প্রবেশে কেবল মৃত্যুই অন্তরায় হয়ে আছে। যে ব্যক্তি এ আয়াতটি বিছানায় শয়নের সময় পড়বে আল্লাহ তার ঘরে, প্রতিবেশীর ঘরে এবং আশপাশের সব ঘরে শান্তি বজায় রাখবেন(সুনানে বাইহাকী)।"
হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়ালাল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, "সুরা বাকারায় একটি শ্রেষ্ঠ আয়াত রয়েছে, যে ঘরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা হবে সেখান থেকে শয়তান পালাতে থাকে(মুস্তাদরাকে হাকিম:২১০৩)।"

কারিগর
ফাতিমা তাহমীম
মিডিয়ামঃ জ্যাকিন পেপারে জলরং
সাইজঃ ১২/১২

ক্যালিগ্রাম

মধ্যবিত্ত

উপরের আর্টে একটি গাছের ছবি দেখছেন বলে মনে হলেও আসলে এটা কিন্তু কোন গাছের ছবি না। এটাকে বলা হয় ক্যালিগ্রাম। শব্দ দিয়ে কোন বস্তুর ছবিকে ফুটিয়ে তোলাই এই আর্টের বিশেষত্ব। এখানেও গাছের স্ট্রাকচারের মাঝে লুকিয়ে আছে সেই শব্দ যা, সমাজের স্ট্রাকচারেও লুকিয়ে থাকে। সমাজের এরা সেইসকল মানুষ এভাবেই লুকিয়ে থাকে। না পারে নিজেদের উন্নতি করতে, আর না যেতে পারে একেবারে নিচে। উপর নিচের বিত্তে আঁটকে থাকা এই সেই বিত্ত। যাদের বড় যত্ন করে মানুষ বলে, মধ্যবিত্ত।

কারিগর
জিহাদ বিন ফয়েজ
আলিম পরীক্ষার্থী,
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা

কালোত্তীর্ণ

লেখক ও তার সামাজিক দায়িত্ব

নিজের মন, অনুভূতি, বিশ্বাস এবং উচ্চতর আদর্শবাদের প্রতি আত্ম-নিবেদনের চেতনার সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। নিজের পছন্দ সম্পর্কে লেখককে অবশ্যই সত্যনিষ্ঠ হতে হবে এবং সত্য ও সাধুতার প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে। স্বীয় মন ও জীবন বিধান নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার অবকাশ লেখকের জন্যে অপরিহার্য। অপছন্দনীয় মানুষ বা ঘটনাবলীকে প্রশংসা করতে লেখক বাধ্য থাকবে না। এর অর্থ হচ্ছে, নিজের অনুভূতি সম্পর্কে চিন্তা করার এবং তা প্রকাশ করার অধিকার লেখকের থাকবে। লেখককে থাকতে হবে দাসোচিত আনুগত্যের ঊর্ধ্বে এবং অন্যান্য লোকের চিন্তাধারার সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্যের বাইরে। নিজের পেশার প্রতি সত্যনিষ্ঠার জন্যে লেখককে স্বাধীন পরিবেশে জীবনযাপন করতে হবে, দাসত্ব এবং শৃংখলার মধ্যে নয়। অর্থাৎ তাকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে স্বাধীন পরিমণ্ডলে অবস্থান করতে হবে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ফলে মানবিক চেতনার সৃজনশীল অগ্রগতি সম্ভব হবে। আর সামাজিক স্বাধীনতা বলে সুসংহত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদের নিশ্চয়তা সৃষ্টি হবে, যে বুনিয়াদের উপর লেখক ও নাগরিক বাধাহীন অগ্রগতি ও উন্নয়নমূলক জীবনের আস্বাদ পেতে পারে। ব্যক্তি, মানুষ এবং জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে লেখক উদাসীন থাকতে পারে না। কারণ স্বীয় অস্তিত্বের জন্যে এবং মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে স্বীয় ভূমিকা অব্যাহত রাখার নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে এটা অপরিহার্য। স্বীয় মৌলিক জিজ্ঞাসা, নীতি ও মূল্যবোধের প্রতি লেখককে আনুগত্যশীল হতে হবে। এগুলোর ভিত্তিতেই লেখক বিকাশ লাভ করে, এবং তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব পরিবর্তিত হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা কিন্তু সহজ কাজ নয়। ক্রমবর্ধিতভাবে সাহিত্যের বাণিজ্যকরণ এবং কারিগরী ও পরিচালনামূলক সমাজ (Managerial society) কাঠামোতে আমলাতন্ত্রের ব্যাপক হস্তক্ষেপের ফলে অপরিহার্যভাবেই লেখকের স্বাধীনতা হ্রাস পেয়েছে। জীবিকা আহরণের জন্যে কিংবা কোন রকমে জীবিকা নির্বাহের জন্যে লেখককে তাঁর আদর্শবাদের সঙ্গে ব্যাপকভাবে আপোষ করতে হচ্ছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে আমাদের অনেক লেখকই সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্কের চেতনা হারিয়ে ফেলেছেন। ফলে তাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তি ধ্বসে গেছে। কিন্তু সময় ও সামঞ্জস্যের সঙ্গে যে সমাজ পরিবর্তনকে গ্রহণ করে থাকে, সেখানে এগুলো স্বাভাবিক।

তাই তারা বন্ধ্যা, শূন্যতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে উন্নাসিকতা সৃষ্টির নীতি গ্রহণ করে থাকেন। কর্তব্যপরায়ণতার খাতিরে লেখককে তার সমকালীন পটভূমিতে সৌন্দর্য, প্রেম ও মানবিকতা সম্পর্কে স্বীয় ধারণা গড়ে তুলতে হয়। বাস্তব সম্পর্কে লেখকের ধারণা তার সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

লেখক সমাজেরই মানুষ, তাই তার সৌন্দর্যবোধ মানবিক সম্পর্কনিরপেক্ষ হতে পারে না, প্রেম ও সার্বজনীন মানবিক চেতনায় সংযুক্ত হয়েই সৌন্দর্যবোধ বিকাশ লাভ করবে। অবশ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে এই সৌন্দর্যবোধ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আঙ্গিক ও রূপরেখার মাধ্যমে এক-এক ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে আত্মপ্রকাশ করবে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একমাত্র স্বাধীন পরিবেশেই লেখক নিজেকে তুলতে এবং প্রেম ও সৌন্দর্য সম্পর্কে স্বীয় ধারণা প্রকাশ করতে সমর্থ। সত্যিকার স্বাধীনতা অবিভাজ্য এবং ব্যাপক- রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত। পরিচালনামূলক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যদিকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আজাদী ছাড়া আজকের জটিল ও আন্তঃনির্ভরশীল সমাজে সৃজনধর্মী সৃষ্টি কঠিন। মূল্যবোধ ও আচরণের মান প্রতিষ্ঠায় লেখককে অবশ্যই সহায়ক হতে হবে। মানব-সভ্যতা সংরক্ষণে এবং মানুষের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা বিকাশেও লেখককে সহায়ক হতে হবে। সাধারণ মানুষের সূক্ষ্মতম অনুভূতি সম্পর্কেও তাকে নিবিড়ভাবে অবহিত হতে হবে এবং এভাবে তাঁকে শান্তিপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তনের বুনিয়াদ গড়ে যেতে হবে। আজকে এই যুগসন্ধিক্ষণে অরাজকতা হতাশাবাদ, পলায়নী মনোবৃত্তি এবং আত্মরতি—সে পুরাতনই হোক বা আধুনিকই হোক- প্রতিরোধই হচ্ছে লেখকের কর্তব্য। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও অগ্রগতির সঙ্গে জনসাধারণের জন্যে ভারসাম্যময় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আনয়নের উদ্দেশ্যেও লেখককে সচেষ্ট হতে হবে। প্রেম ও সৌন্দর্য সম্পর্কে নিজের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে লেখকের পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে হবে। ন্যায়বিচার একটা সার্বজনীন মানবিক ধারণা, কিন্তু এর প্রয়োগ আপেক্ষিক। সুতরাং লেখকের উচিত ন্যায়বিচারের সাধারণ ও প্রায়োগিক উভয় দিকেই গুরুত্ব আরোপ করা। আজকের দিনে সমাজ-কাঠামো দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, কারিগরী অগ্রগতি হচ্ছে দ্রুততর গতিতে। এর ফলে সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তলিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর প্রকটতা থেকে একনায়কত্বের প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। তদুপরি আমাদের সমাজ কাঠামোতে বর্তমান একনায়কত্বের সমর্থকরা তাকে আরও জোরদার করেছে। সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার প্রতি প্রধানতঃ এই ধরনের স্বৈরাচারী হুমকি বিদ্যমান এবং লেখকরাও অপরিহার্যভাবেই এই হুমকির আওতাধীন। সুতরাং লেখককে অবশ্যই এ সম্পর্কে হুশিয়ার থাকতে হবে। উন্নততর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনের ভিত্তি রচনার উদ্দেশ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বুনিয়াদ সুসংহত করার ব্যাপারে লেখকেরও দায়িত্ব রয়েছে।

সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য : অধ্যাপক ড. হাসান জামান, জ্ঞান বিতরণী, ২০১২, ১২৫-১২৭ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত

কালোত্তীর্ণ

অতীতের অন্ধ আনুগত্য

আমাদের সমাজে নায়েবে রসুল যাহারা ছিলেন, তাহারা বর্তমানে হইয়া উঠিয়াছেন এক একটা নায়েবে খোদা, তাহাদের মতের খেলাফ কোন কথা হইলে অমনি তাহাদের অমোঘ অস্ত্র ফতোয়া 'কাফের হো গেয়া'। ইহারা বুঝেন না, মানুষ কি চিরদিন অতীতের নির্দেশিত পথ ধরিয়া চলিবে? মানবেতিহাসে এই চৌদ্দশত বৎসরের সাধনা কি মুসলমানের জন্য একেবারে ব্যর্থ হইবে? সমগ্র জাতি নিচয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় মানব সভ্যতার সমুন্নত মত ও পথগুলিকে শুধু আমাদের অতীতের সঙ্গে মিলে না বলিয়াই কি আমরা অস্বীকার করিয়া বসিব? যাহাদের মস্তিষ্ক সজীব, তাহারা নিত্য নূতন নূতন পথে জ্ঞানের অভিযান চালাইবেন। নূতন নূতন পথের আবিষ্কার করিবেন, ইহাতে যদি অতীতের বিরুদ্ধতা হয়, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। অতীতের বিরুদ্ধতা মুসলমানের জন্য বড় ক্ষতির কথা নয়। কিন্তু অতীতকে আঁকড়িয়া ধরিয়া তাহার জীবনে চলার পথে একটা ফুলস্টপ দেওয়াই তাহার পক্ষে মারাত্মক। অতীতকে অস্বীকার করিতে আমি বলি না। কিন্তু অতীতের দিকে ফিরিয়া যাওয়াতেই আমার আপত্তি। অতীতের কাছে যতখানি আলো পাওয়া যায় তাহা আমি হৃদয় ভরিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু পুরাতনের গৌরব দিয়া তাহার অন্ধকারকে নিতে আমি রাজী নই। ইসলামের আবির্ভাব হইতে এই চৌদ্দশত বৎসরের মধ্যে মানুষের জ্ঞানে অনেক উন্নতি হইয়াছে। কাজেই অতীতের সঙ্গে আধুনিক মানুষের জীবন যাত্রার বিরুদ্ধতা অনিবার্য্য। পিতামহেরা যে পথ ঘোড়ায় চড়িয়া দুই দিনে অতিক্রম করিতেন, আমরা যদি আজ তাহা মোটরে অর্ধদিনে বা এরোপ্লেনে এক ঘণ্টায় অতিক্রম করি, ইহাতে

পিতামহের ট্র্যাডিশন ভঙ্গ করা হয় সত্য, কিন্তু অপরাধ করা হয় না, একথা সকলেই বুঝে। জীবন্ত প্রাণবাণ মানুষের মন ও মস্তিষ্ক অনুসন্ধিৎসু। কোন একটা জিনিষকে যে কোন প্রকারে পাইয়া তাহার তৃপ্তি নাই। তাহার সত্য পরিচয় অনুসন্ধানেই তাহার আনন্দ।

অধ্যাপক আবুল ফজলের 'তরুণ আন্দোলনের গতি' প্রবন্ধ থেকে নির্বাচিত; শিখা সমগ্র : বাংলা একাডেমী, ২০০৩, ৪৪১ পৃষ্ঠা

কালোত্তীর্ণ

আগে টিকে থাকা পরে সৌন্দর্য

শ্রেষ্ঠতার আরাধনাই মানুষের কর্তব্য, নিকৃষ্টতার পূজা নয়। আর শ্রেষ্ঠতার আরাধনার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় প্রকৃত অনুরাগ। অনুরাগই কঠিন ব্যাপারকে সহজ করে তোলে, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়। শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসমূহকে ভালোবাসলেই নিকৃষ্ট বৃত্তিসমূহের দাবি কমে আসে, নইলে তাদের জুলুমের অন্ত থাকে না। বড়কিছুকে ভালো না বাসলে ছোটকিছুর অত্যাচারে জীবন জীর্ণ হয়ে আসে, ভালোবাসাকে বড় না জানলে ঘৃণা-বিদ্বেষের জয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' নীতি প্রয়োজনের ভাঁওতায় বড় জিনিসকে ছোট, আর ছোট জিনিসকে বড় করে তুলে মানুষের অশেষ অকল্যাণ করে। সৌন্দর্য ও আনন্দের ওপর জোর দিয়ে টিকে থাকার প্রবৃত্তির ওপর জোর দেয় বলে তা জীবনের কদর্য ক্ষুধাকেই বড় করে থোলে। সুতরাং 'আগে টিকে থাকা পরে সৌন্দর্য' এই নীতির প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো; কেননা, তাতে শালীনতার ও শোভনতার দাবি নিচে পড়ে যায়, আর বর্বর অধিকার-বৃত্তি লেলিহান জিহ্বা মেলে ধেই ধেই নৃত্য করতে থাকে। তাকে সংযত করতে পারে সৌন্দর্যপ্রেম, অন্য কিছু নয়। নীতির শাসন এখানে ব্যর্থ। যোগ্যতমের উদ্বর্তন নীতি মানুষকে ইতরতা থেকে মুক্ত হতে দেয় না, ছোটখাটো স্বার্থের নিগড়ে বেঁধে রেখে তাকে নীচমনা করে গড়ে তোলে। ছোট ভাব সবসময়ই বড় ভাবকে ব্যর্থ করেছে ও করবে। অতএব, বড় ভাবের প্রতি বিশেষ অনুরাগ থাকলে তার কোনো ভরসা থাকে না। সত্যের জয় হবেই এ-কথা ভুল; জয় হোক না হোক, সত্যের জন্য প্রাণপাত করা উচিত, একথাই ঠিক। মিথ্যা আশায় সত্যের জয় কমে আসে। পরাজয়ের লক্ষণ দেখলে মন দ্বিধান্বিত হয়।

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'মেরুদণ্ড' প্রবন্ধ থেকে নির্বাচিত;
মোতাহের হোসেন চৌধুরীর নির্বাচিত প্রবন্ধ : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র,
১৯৯০, ৭৭ পৃষ্ঠা

বাঙালি পরিসংখ্যানবিদ, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ
কাজী মোতাহার হোসেনের ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী
আগামী ৯ অক্টোবর

সওগাত পরিবারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা ও স্মরণ

পুরোনো হাইকোর্টের রাস্তা ধরে চলেছি এমন সময় কোথা থেকে ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। খোলা সড়কের উপরই আচার্য শহীদুল্লাহর পদচুম্বন করে বসলেন। অফিস ফেরত কর্মচারীরা লাইনবন্দী হয়ে চলেছেন বাড়ীর পানে। সেদিকে খেয়াল করার অবসর নেই কাজী সাহেবের। তিনি বোধকরি কার্জন হল থেকেই আসছিলেন। আচার্য শহীদুল্লাহ বললেন : 'আপন ভোলা নিরহংকার মানুষটি। বিদ্বান এবং গুণী।' কাজী সাহেব আচার্য শহীদুল্লাহর প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন না কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকর্মী ছিলেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল এবং ফজলুল হক হলেও কাজ করেছেন তাঁরা এক সংগে। তাছাড়া বিবাহ সূত্রে কাজী সাহেবের শ্বশুর কুলের সঙ্গে আচার্যের আত্মীয়তা। বয়সেও তিনি কাজী মোতাহার হোসেনের চেয়ে বারো বছরের বড়। সুতরাং আচার্য শহীদুল্লাহকে অকুণ্ঠভাবে সালাম জানিয়ে, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে কাজী সাহেব তাঁকে যেমন সম্মানিত করলেন তেমনি তিনি নিজেরও সম্মান বাড়ালেন। তারা দুজনই বৃদ্ধ। জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত। তথাপি একজন অপরজনকে সেদিন যেভাবে হৃদয়ের প্রীতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ঢেলে দিলেন সেটা সবারই অনুকরণীয়।

[অন্তরঙ্গ আলোকে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : গোলাম সাকলায়েন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭০, ৫২ পৃষ্ঠা]

কাজী সাহেবের সরল জীবনযাপনের কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : এই কাজী সাহেব ১৯২১ সাল থেকে ৪৫-৪৬ সাল পর্যন্ত Lecturer class II. মাইনে পান দুশ' টাকা। অথচ এ নিয়ে কিছু অনুযোগ করেছেন বলে
মনে হয় না।
সরদার ফজলুল করিম : সবার ক্ষেত্রেই হয়তো এই রেওয়াজ ছিলো। তাই আমি অধ্যাপক রাজ্জাককে জিগ্যেস করলাম : তার মানে এমনও তো হয় নি যে, কাজী সাহেবকে অন্যায়ভাবে অতিক্রম করে অপর কেউ উচ্চতর পদ পেয়েছে কিংবা অধিকতর মায়না পেয়েছে? এমন কি হয়েছে?

অধ্যাপক রাজ্জাক বললেন : নিয়ম হিসেবে নয়। তবে দু'একটা ব্যতিক্রম ছিলো না, এমনও নয়। শিক্ষকদের মধ্যে অল্প কিছু ছিলো যারা selection grade-এ দু'শ পার হয়ে দু'শো পঞ্চাশ পেতো। একথা হয়তো ঠিক যে ওঁর Physics-এ research work কিছু ছিলো না। কিন্তু class teacher হিসেবে he was one of the most eminent... এতে আমার কোনো সন্দেহ নাই যে, কাজী সাহেবের ওপর অন্যায় করা হয়েছে। কিন্তু সেই অন্যায় নিয়ে কোনোদিন তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ ছিলো না। ২০০ টাকায় ২৫ বছর চাকরি করেছেন। মনে অনেক জোর ছিলো...। পরে উনি Satistics-এ PHD করেন। সে অনেক পরে। দেশ বিভাগের হয়তো পরে। Statistics Dernartment তখনো আলাদা হয় নি। Mathematics এবার একটা part হিসেবে Statistics-এর বিভাগ করে কাজী সাহেবকে রিভার করা হয়। এরপর জেনকিনস যখন ভাইস চ্যান্সেলর তখন তাঁকে প্রফেসর করা হয়। দীর্ঘ জীবন কাজী সাহেবের। কিন্তু এর প্রথম ২৫-৩০ বছর আচার আচরণে একেবারেই তুলনাইন। শিক্ষক হিসাবে তাঁর প্রথম দিককার জীবনধারণ made impression on the younger people. জ্ঞানের ক্ষেত্রে আত্মনিবেদিত, অন্য কোন চিন্তার স্থান নাই—এই বৈশিষ্ট্য was one of the major elements in the remaking of the mind of the younger generation।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক-এর আলাপচারিতা : সরদার ফজলুল করিম, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৪, ১১০ পৃষ্ঠা

কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী আগামী ১০ অক্টোবর।

সওগাত পরিবারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা ও স্মরণ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বিষয়বস্তু-সংগ্রহ, ঘটনা-নির্বাচন ও জীবনাংশ আহরণের ক্ষেত্রে জাতিক, স্বাদেশিক কিন্তু জাগ্রত বোধ, প্রকাশ-প্রকরণের ক্ষেত্রে তিনি আন্তর্জাতিক, বিশ্বমনস্ক। অন্য কথায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ শিল্পী হিসেবে সেই প্রাণবান বৃক্ষ যার শিকড় ঐতিহ্যের মর্মমূলে প্রসারিত কিন্তু তার শাখা-প্রশাখা, পত্রগুচ্ছ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উর্ধ্বচারী। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সচেতন, পরীক্ষাপ্রিয়, মেধাবী কথাকোবিদ, 'লেখকদের লেখক'।

[সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম : জীনাত ইমতিয়াজ আলী, নবযুগ প্রকাশনী, ১৯৯২, ১৯৬ পৃষ্ঠা থেকে নির্বাচিত]

মনে পড়ে, আমাকে ও দেশভাগ এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিল, জানিয়েছিল

কলকাতার সেন্ট পল কলেজে তার ছাত্রজীবনের কথা। ও বর্ণনা করেছিল, একবার পিকনিকে গিয়ে দুজন মুসলমান

ছাত্রকে আলাদা খেতে হয়েছিল। ও বলেছিল, রেলস্টেশনে পানির কল থাকত দুটি। একটা হিন্দুদের জন্য, একটা মুসলমানদের। একটি ঘটনার বিবরণ শুনে খুব আমোদ পেয়েছিলাম। নয়াদিল্লিতে প্রেস অ্যাটারে দায়িত্ব পালনকালে

সে একবার ট্রেনে ভ্রমণ করছিল। কামরায় দুজন চমৎকার নারীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। একজন মা, অন্যজন মেয়ে। তারা খুব শিগগিরই আপনজনের মতো গল্পগুজব জমিয়ে বসে। একসময় ট্রেনটি এ দুই মহিলার গন্তব্যে এসে পৌঁছায়। এখানে ওয়ালীকে তার ট্রেন পাল্টাতে হবে। তখন প্রায় মধ্যদুপুর। ওয়ালীর ট্রেন আসার আরো দুঘণ্টা দেরি। কাজেই দুই মহিলা তাকে তাদের বাড়িতে গিয়ে অন্নগ্রহণের নিমন্ত্রণ জানাল।

ওয়ালী রাজি হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। দুপুরের খানা যখন প্রস্তুত, দুই মহিলা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে জানাল, ওরা তার বর্ণ জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছে। ওয়ালীর গায়ে ইউরোপীয় সাহেবি পোশাক। দেখে তার জাতপাত বোঝার উপায় নেই। ওয়ালী খুবই দোটানায় পড়ে গিয়ে ভাবল, যদি সে বলে ফেলে সে মুসলমান, এরা খুবই আহত হবে। নির্ঘাৎ এদের আবার ঘরদোর পবিত্র করার কাজে নেমে পড়তে হবে । কাজেই তাদের বিব্রত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে সে বলল যে, সে ব্রাহ্মণ। মহিলা দুজন ক্ষত্রিয়। বামুনের সঙ্গে একাসনে বসে খাওয়া তাদের চলে না। কাজেই তারা পাশে দাঁড়িয়ে থেকে ওয়ালীর পাতে ভাত বেড়ে দিল। ওয়ালীকে একাই খেতে হলো।

ও আমাকে বাবুরনামা পড়িয়েছে। ওর কাছে আল বেরুনির ভারত বইটির একটি চমৎকার সংস্করণ ছিল। তা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে ওর কাছে ছিল প্রচুর বইপুস্তক। সফোক্লিসের তো প্রাচীন গ্রিক হোক আর ফরাসি ভরতের বা বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই হোক, বিশ্বনাগরিক হিসেবে পৃথিবীর সব সাহিত্যকে ও নিজের সাহিত্য বলে গণ্য করত। তাদের চিন্তা, তাদের পদ্ধতি বা তাদের কাছ থেকে যা কিছু সে আদায় করতে পেরেছে, তার সবই সে তার নিজের সংস্কৃতি ও মানুষ- পূর্ব বাংলার মুসলমান কৃষকদের ওপর প্রয়োগ করত। ও তার লেখার মাধ্যমে ওর দেশের মানুষের দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা দূর করার জন্য যতটা সম্ভব ভূমিকা রাখতে চাইত। সে একবার বলেছিল, ‘আমি একজন মুক্ত মানুষ। জগৎ আমাকে গ্রহণ করুক আর নাই করুক, পুরো জগৎটিই আমার।’ পশ্চিমা আর অপশ্চিমা সাহিত্যের মধ্যে ও কোনো তফাত করত না। জাপানি হোক আর ইতালীয়ই হোক, হোক তা প্রাচীন বা আধুনিক, বিশ্বের সব সাহিত্যকে ও মানুষের অভিন্ন উত্তরাধিকার বলে গণ্য করত।

আমার স্বামী ওয়ালী : আন মারি ওয়ালীউল্লাহ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১২ থেকে নির্বাচিত

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ৬৭তম মৃত্যুবার্ষিকী আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ১৪৯তম জন্মবার্ষিকী ১১ অক্টোবর

সওগাত পরিবারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা ও স্মরণ

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের অবদানের মূল্যায়ন
অধ্যাপক আহমদ শরীফ

গোটা বাঙলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদই প্রথম [এবং আট বছর ধরে প্রধানও ছিলেন।] বাঙলা ভাষী ও উর্দুওয়ালা দেশী মুসলিমদের জানিয়ে দিলেন যে বৌদ্ধ-হিন্দু সমাজ থেকে দীক্ষিত দেশজ মুসলিমরা চিরকালই বাঙলাভাষী গাঁ গঞ্জের মানুষ। এদেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রাগৈতিহাসিক। তাদের সঙ্গে তুর্কী-মুঘল শাসক কিংবা আরবের ইরানের ও মধ্য এশিয়ার মুসলিমদের কোনও রক্তের ভাষার, ঐতিহ্যের, সংস্কৃতির অর্থবিত্তের এবং সামাজিক-বৈবাহিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ কখনো ছিল না। দেশজ মুসলিমদের জীবনাচারে এ দেশের প্রাকৃতিক প্রতিবেশের ও বৌদ্ধ-হিন্দু ঐতিহ্যের বিশ্বাস-সংস্কারের, আচার-আচরণের সাদৃশ্য ছিল গভীর নিবিড় ও ব্যাপক। তাদের খাদ্যে, পোশাকে, শাস্ত্রে, সমাজে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ছিল দেশ-কালের রূপ। তারা স্বদেশের স্বকালের স্ব-জীবনের ও স্বসমাজের চাহিদানুগ জীবনই যাপন করেছে। সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায়, রোগে-শোকে, বিত্তে-বেসাতে এবং দারিদ্র্যে-অনাহারে, ঝড়-বন্যা-খরায় এই আকাশের নিচে মাটি কামড়েই বেঁচেছে কিংবা মরেছে প্রজন্মক্রমে আজকের মতোই। হিন্দুদের মতোই হিন্দুদের সমকালেই এবং সঙ্গেই তুর্কী-মুঘল আমলে বাঙালী মুসলিমরা লেখনী ধারণ করেছিল বাঙলাভাষার মাধ্যমে সাহিত্য সৃষ্টিতে, শাস্ত্র প্রচারে, সঙ্গীত রচনায়, সমাজ সংস্কারে, সংস্কৃতি নির্মাণে ও প্রসারে।

১৮৯৩ সন থেকে শুরু হয়েছিল তার স্বঘরে ও পরঘরে পুথি আবিষ্কার ও পুথি সংগ্রহ, আমৃত্য তাঁর এ কাজে বিরাম বিরতি বিরক্তি ছিল না। তিনি একাধারে পুথি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিচিতি রচন এবং সাময়িক পত্রিকায় তার পরিচিতি প্রচার লক্ষ্যে প্রবন্ধ লেখনে ও প্রকাশনে নিরত ছিলেন সারাটা জীবন। তাঁরই ত্রিশ বছরের একক প্রয়াসে ও প্রচারে এটিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বাঙালী মুসলমানদের ক্বচিৎ কেউ বহিরাগত হলেও তারা দেশজ মুসলিম, এবং তাদের মাতৃভাষা বাংলা।

বাঙলা ভাষায় রয়েছে হিন্দুদের মতোই তাদের পূর্ব পুরুষের বিপুল ও বিচিত্র অবদান। সাহিত্য, সঙ্গীতে, শাস্ত্রে, ইতিবৃত্তে ও জীবনচরিত্রে যা রয়েছে তা আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হলে গুণে-মানে-মাহাত্ম্যে ও কলেবরে ভূঁইফোড় অর্বাচীন উর্দুর গৌরব ম্লান হয়ে যাবে।

সাহিত্যবিশারদের আগে এবং সমকালে এশিয়াটিক সোসাইটিতে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে, কিংবা দীনেশচন্দ্র সেনের, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অথবা ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির উদ্যোগে পুথি সংগ্রহ হয়েছে বটে, কিন্তু সবাই হিন্দু ঘর থেকে হিন্দু পুথিই সংগ্রহ করেছেন; মুসলিম ঘরে বাঙলা পুথি থাকতে পারে বলে হয়তো তাঁরা কল্পনাও করতে পারে নি। তাঁদের ধারণা ছিল দেশজ মুসলিমরা যেহেতু নিরক্ষর জোলা-নিকেরী-কৈবত চাষী-মজুর সুতরাং তাদের, সাহিত্য-সংস্কৃতির কোন চর্চা থাকার কথা নয়। আর গ্রামের ও শহরের উর্দুভাষী খান্দানী ধনী-মানী জমিদাররা তো বাঙলা জানেই না, লিখবে কি! এ ধারণা বশেই হিন্দু পুস্তকসমালোচকরা মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ প্রমুখের পুস্তক সমালোচনা সূত্রে লিখতেন যে আমাদের শোনাও ছিল এবং জানাও ছিল যে মুসলিমরা বাঙলা জানে না, কিন্তু এঁর মতো বিশুদ্ধ বাঙলা অনেক হিন্দুতেও লিখতে পারেন না ইত্যাদি। আবদুল করিম সাহিত্যবিশরাদই হিন্দুদের সে অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা ঘুচিয়েছিলেন, মুসলিমদের মনেও জাগিয়েছিলেন আত্মসম্বিৎ, আত্মপ্রত্যয় ও আত্ম-জিজ্ঞাসা ওই পুথির পাথুরে দলিল আবিষ্কার ও প্রদর্শন করে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদই গোটা বাঙলাদেশে প্রথম ব্যক্তি যিনি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষের পুথি সংগ্রহে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছিলেন, পরিচিতি লিখেছিলেন ও প্রচার করেছিলেন এবং গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন জাত বর্ণ ধর্ম বিষয় অভেদে, তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের নাম- সারদামঙ্গল, গোরক্ষবিজয়, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস, গঙ্গামঙ্গল, সত্যনারায়ণ, মৃগলুব্ধ মৃণলুব্ধ সম্বাদ প্রভৃতি এর প্রমাণ। এ অসাম্প্রদায়িক চেতনা সে-কালে দুর্লভ ছিল। এক্ষেত্রে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ অনন্য। আর এক ক্ষেত্রেও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ অতুল্য। উনিশ শতকের মুসলিম লেখকদের রচনার বিষয়বস্তু ছিল সাধারণভাবে বহির্বঙ্গীয়, এমনকি বহির্ভারতীয় এবং পনেরো শতকের পূর্বেকার আরবের ইরানের ইরাকের স্পেনের ও মধ্য এশিয়ার ইসলাম ও মুসলিম সুলতান দরবেশ প্রভৃতি [মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখ ক্বচিৎ কেউ দেশী মুসলিম নিয়েও লিখেছেন] এবং বাঙালী হিন্দুরা যেমন সারা ভারত ঢুঁড়ে হিন্দুর প্রাচীন পৌরাণিক মধ্যযুগীয় ঐতিহাকে গৌরব-গর্বের বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন, মুসলিমরাও তেমনি স্বধর্মী নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। ফলে বাঙালী হিন্দু যেমন এভাবে স্বধর্মসচেতন কেবল হিন্দু হতে চেয়েছেন, তেমনি মুসলিমরাও দেশ-কাল নিরপেক্ষ বিশ্বমুসলিম জাতি-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে প্রয়াস পেয়েছেন। এক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট লেখকদের আগে মুসলিমদের মধ্যে কেবল সাহিত্যবিশারদই তার সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজ ইতিহাস প্রভৃতি চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে বাঙলার এবং বাঙালীর মধ্যেই তাঁর মানস বিচরণ সীমিত রেখেছিলেন। বাঙলার মাটি ও মানুষই ছিল তাঁর সারাজীবনের অনুধ্যানের বিষয়। স্বধর্ম বা বহির্বঙ্গীয় সুধর্মী তাঁর চিন্তা-চেতনায় কখনো প্রশ্রয় পায় নি। এমন হিন্দুও ছিল সেকালের বাঙলায় বিরল। তাই সাহিত্যবিশারদের এ যুগদুর্লভ ও দেশদুর্লভ মানববাদ এবং স্বদেশের মাটি ও নির্বিশেষ মানুষপ্রীতি তাঁর চিন্তা-চরিত্রের অসামান্য লক্ষণ বলে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যে-পরিবেশে একালে যেখানে-সেখানে আমরা সংস্কারমুক্ত অনেক উদার মানুষ পাচ্ছি সে-পরিবেশ আবদুল করিমের ছিল অভাবিত। কর্ণফুলী নদী তীর থেকে টেনুফি অবধি স্থান পরিসরে তিনিই ছিলেন মুসলিদের মধ্যে প্রথম প্রবেশিকা পাশ ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমান।

সাহিত্য-সংস্কৃতি মনস্ক হওয়াটাই ছিল একটা অপ্রত্যাশিত আকস্মিক প্রবণতা, সে-মানুষ আবার গল্প-উপন্যাস না লিখে যে ঐতিহ্য ও প্রত্ন চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ে মানুষের জাতির বিস্মৃত বা লুপ্ত ঐতিহ্য সাহিত্যাদি বিষয়ে লিখিত পুঁথি সংগ্রহে হলেন অগ্রহান্বিত। এক্ষেত্রে প্রেরণা-প্রবর্তনা দেয়ার কেউ ছিল না তাঁর।

যে-বিষয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের কোনো ধারণাই নেই, সে-বিষয়ে স্বপক্ক গুরুত্ববোধ তাঁর দেশ-কাল-পরিবেষ্টনীর পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে তাঁর মনমানসের, তাঁর মনীষার ও মনস্বিতার গভীরতা ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। স্বয়ং প্রায় অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তি হয়েও তিনি আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রবন্ধ লিখে কোলকাতার জাঁদরেল হিন্দু লেখকদের প্রখ্যাত পত্রিকায় পাঠিয়েছেন। তাঁর জীবনে গোড়া থেকেই কোন প্রবন্ধ ভাব-ভাষা-বিষয় ও বক্তব্যের কারণে ফেরত আসে নি। যে পত্রিকায় যা দিয়েছেন ছাপা হয়েছে। সংখ্যায় কম হলেও তিনি অন্য অনেক বিষয়েই প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলো যথা সময়ে ছাপা হয়েছে। তাঁর যৌবনে দেশে হেন সাময়িক পত্রিকা ক্বচিৎ ছিল যাতে তিনি কম-বেশি অন্তত একটি হলেও লেখেন নি। এক সময়ে তিনি বাঙলা ভাষার প্রকাশিত প্রায় চল্লিশ খানা পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন।

১৯০৩ বা ১৯০৭ সনের পরেও ১৯১৮ সনেও যখন বাঙলাকে মাতৃভাষা রূপে স্বীকৃতি দানে কিছু কিছু মুসলিম দ্বিধাগ্রস্ত, তখন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদই নির্ভীকউদাত্ত কণ্ঠে বাঙলার বুকে প্রথম ঘোষণা করলেন যে, বাঙলাভাষা বাঙালী মুসলিমদের কেবল মাতৃভাষাই নয়, মুসলিমদের জাতীয় ভাষাও [১৩২৫ আশ্বিন সংখ্যা, আল ইসলাম]। সেদিন এ মত লিখিতভাবে উচ্চারণ সহজ ছিল না, প্রতিবাদ করেছিলেন অনেকেই, কিন্তু সাহিত্যবিশারদ অটল ছিলেন স্বমতে।

অতএব বাঙালী মুসলিমকে আত্মচেতনা দিয়ে মানব-প্রবাস থেকে স্বদেশে স্বঘরে ফেরানোতে, তাদের পিতৃপুরুষের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহের সন্ধান দিয়ে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগসৃজনে, মাতৃভাষাকে জাতীয়ভাষারূপে বরণের প্রবর্তনা দানে, দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধির প্রেরণা দানে, দেশজ মুসলিমের হিন্দু-বৌদ্ধ ঐতিহ্যের, বিশ্বাস-সংস্কারের ও আচার-আচরণের যুক্তিসঙ্গত ঐতিহাসিক কারণ নিরূপণ করে তাদের হীনমন্যতা ঘুচিয়ে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগানোর [এবং একালে নববর্ষ, বসন্ত মেলা, যাত্রা, চর্যাগীতি প্রভৃতির প্রতি মুসলিমদের সগর্ব-আসক্তি আর এসব নিয়ে আবহমান বাঙালী পরিচয়ে গৌরববোধ প্রভৃতি এ সূত্রে স্মর্তব্য] আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের একক দান অশেষ অপরিমেয়। তাঁর কাছে আজকের বাঙ্গালী মুসলিমের অদৃশ্য ঋণ অশেষ। দেশ-কালের প্রতিবেশে তার অবদানের গভীর ও ব্যাপক গুরুত্ব উপলব্ধি করেই সম্ভবত মোদিনীপুরের আজহারউদ্দিন খান তাঁর লিখিত সাহিত্যবিশারদ জীবনীর নাম রেখেছেন ‘মাঘ নিশীথের কোকিল’। বলতে গেলে মধ্যযুগের প্রায় সব মুসলিম লেখক এবং অনেক হিন্দু লেখক তথা কবি তাঁরই আবিষ্কার। তাঁর আবিষ্কার ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান নিয়ে কয়েকটি বিপুলকায় ইতিহাস গ্রন্থ। এসূত্রে সুফিয়ান মোহাম্মদ নাজিরুল ইসলামের, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর, শাহেদ আলির, সুকুমার সেনের ইতিহাস উল্লেখ্য। তাঁর এসব দানে গুরুত্ব দিলে তাকে সীমিত অর্থে একজন যুগ-পুরুষ বলেই মানতে হবে।

*মূল লেখাটির ভূমিকা ও উপসংহার বাদ দিয়ে মর্মশাঁস হিসেবে সংক্ষেপিত আহমদ শরীফ রচনাবলী ৪ : আহমদ কবির সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ২০১০, ২৯৩-৯৬ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত হয়েছে।

গল্প,কবিতা, প্রবন্ধসহ সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গে সাজানো হয়েছিল
অনলাইন ভিত্তিক মাসিক ম্যাগাজিন সওগাত'র

মহররম সংখ্যা

ডাউনলোড

বিজ্ঞপ্তি

সওগাত রবিউল আউয়াল সংখ্যায় যারা লিখতে চান তারা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ বা ভ্রমণ কাহিনী লিখে ১৩ অক্টোবরের মধ্যে ই-মেইল করুন নিচের ঠিকানায়:
monthlysowgat@gmail.com

ফেসবুক গ্রুপ

সওগাতের ফেসবুক গ্রুপে যুক্ত হয়ে আপনিও হয়ে যান সওগাত পরিবারের একজন।

https://www.facebook.com/groups/sowgat

“আমরা তিনটি উপায়ে প্রজ্ঞা লাভ করি: প্রথমত, গভীর চিন্তা বা অনুধ্যানের মাধ্যমে যেটা মহত্তম উপায়; দ্বিতীয় যে উপায়ে প্রজ্ঞা লাভ করি সেটা হলো অনুকরণ, যেটা সহজতম; আর তৃতীয় উপায় হচ্ছে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, যেটা সবচেয়ে তেতোময়
_____কনফুসিয়াস”